# আমার দেখা নয়াচীন

শেখ মুজিবুর রহমান

# আমার দেখা নয়াচীন

# আমার দেখা নয়াচীন

১৯৫২ সালে জেল হতে বের হলাম, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর। জেলে থাকতে ভাবতাম আর মাঝে মাঝে মওলানা ভাসানী সাহেবও বলতেন, 'যদি সুযোগ পাও একবার চীন দেশে যেও।' অল্পদিনের মধ্যে তারা কত উন্নতি করেছে। চীন দেশের খবর আমাদের দেশে বেশি আসে না এবং আসতে দেওয়াও হয় না। তবুও যতটুকু পেতাম তাতেই মনে হতো যদি দেখতে পেতাম কেমন করে তারা দেশকে গড়েছে!

হঠাৎ সেপ্টেম্বর মাসে আমন্ত্রণ এলো পিকিং-এ শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে হবে। *পাকিস্তান শান্তি কমিটি* আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। পূর্ব বাংলা থেকেও কয়েকজনকে যেতে হবে। ৩৭টি দেশ এতে যোগদান করবে। অনেকে বলতে পারেন কম্যুনিস্টদের শান্তি সম্মেলনে আপনারা যোগদান করবেন কেন? আপনারা তো কম্যুনিস্ট না। কথাটা সত্য যে আমরা কম্যুনিস্ট না। তথাপি দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের শান্তি সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, 'আমরা শান্তি চাই।' কারণ যুদ্ধে দুনিয়ার যে ক্ষতি হয় তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করতে পারি; বিশেষ করে আমার দেশে–যে দেশকে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কাঁচামাল চালান দিতে হয়। যে দেশের মানুষ না খেয়ে মরে, সামান্য দরকারি জিনিস যোগাড় করতে যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে দেশে যুদ্ধে যে কতখানি ক্ষতি হয় তা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন। কোথায় ইংরেজ যুদ্ধ করছে, আর তার জন্য আমার দেশের ৪০ লক্ষ লোক শৃগাল কুকুরের মতো না খেয়ে মরেছে। তবুও আপনারা বলবেন, আজ তো স্বাধীন হয়েছি। কথা সত্য, 'পাকিস্তান' নামটা পেয়েছি; আর কতটুকু স্বাধীন হয়েছি আপনারা নিজের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। যাহা হউক, পাকিস্তান গরিব দেশ, যুদ্ধ চাইতে পারে না। যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের জনগণের সকলের চেয়ে বেশি কষ্ট হবে এই জন্য। তাদের পাট, চা, তুলা অন্যান্য জিনিস বিদেশে বিক্রি না করলে দেশের জনগণের কষ্টের সীমা থাকবে না। দুর্ভিক্ষ মহামারি সমস্ত দেশকে গ্রাস করবে। তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য, পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য–যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।

ঠিক করলাম শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে হবে। আমাদের পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, যাকে আমরা সকলে 'মানিকভাই' বলি, বন্ধুবর খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আর ইউসুফ হাসান এবং আমি, এই পাঁচজন যাবো ঠিক হলো। কিন্তু পাসপোর্ট কোথায়? ওটা না হলে তো আর কোনো প্লেন আমাদের নেবে না। সকলেই সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছে, করি নাই আমি–কারণ কোথাও আবার সভা করতে গিয়ে থাকব। আরও ভেবেছিলাম, বোধ হয় পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। যা হোক, যাবার মাত্র একদিন পূর্বে বন্ধুবর ইয়ার মোহাম্মদ খান (তৎকালীন আওয়ামী লীগের ট্রেজারার), যিনি আওয়ামী লীগের ট্রেজারার, আমাকে বললেন, আজই দরখাস্ত করো। চেষ্টা করে দেখা যাবে। যা হউক, তাঁর ও আতাউর রহমান সাহেবের কথায় দরখাস্ত করলাম। কিন্তু পরে আবার জানতে পারলাম আমার দরখাস্ত পাসপোর্ট অফিসে পৌঁছে নাই। মহাবিপদ! পাসপোর্ট অফিসার জনাব শুকুর সাহেব খুব ভালো লোক। ব্যবহারও চমৎকার, আর কাজও করতে পারেন। তাঁর মতো কর্মচারী হলে দেশের উন্নতি হতে বাধ্য। তিনি বললেন, আবার আমার কাছে আর একটা দরখাস্ত করুন। তাই করলাম। তার হাতে তো আর ক্ষমতা নাই–'লাল ফিতার প্যাঁচ।' করাচির হুকুম প্রয়োজন। তাহা না হলে তো পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কোনো জলসাই হয় না। খবর নিয়ে দেখা গেলো তখনও হুকুম পৌঁছে নাই। হোম ডিপার্টমেন্টের অনুমতি নাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সকলেই বসে রইলাম পাসপোর্ট অফিসে। পরের দিনই যেতে হবে–কোনো কিছু ঠিক করতে পারি নাই। কাপড় জামা টাকা-পয়সা কোনো কিছুর জোগাড় নাই। রাত্রে করাচি থেকে মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের কাছ থেকে খবর পেলাম সিট রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। সকালে আবার পাসপোর্ট অফিসে গেলাম। প্রায় দশটার সময় খবর এলো হুকুম এসেছে পাসপোর্ট দিয়ে দিতে। কিন্তু ১২টায় বিওএসি প্লেন ছেড়ে যাবে–এর মধ্যে কী করবো? ভেবে কূল পাই না। সাড়ে এগারোটার সময় পাসপোর্ট পেলাম। ফোন করে জানলাম, প্লেন ২৪ ঘণ্টা লেট। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সময় কিছু পাওয়া গেল। পাসপোর্ট নিয়ে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে গেলাম। ব্রহ্মদেশের কনসাল অফিসে গেলাম। আমরা সকলেই এক সাথে ঘুরছি। পরে জানা গেল ভিসার প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা তো এখনও 'রানিমা'র প্রজা।

আমাদের বিদেশে লিখতে হবে পাকিস্তানি ব্রিটিশ নাগরিক। হায়রে স্বাধীনতা! বাড়ি ফিরতে প্রায় ৬টা বেজে গেল। টাকার প্রয়োজন, আমরা তো বড়লোক নই। আর পাকিস্তানে ফটকা ব্যবসাও করতে আসি নাই যে নগদ টাকা থাকবে! ধার করতে হবে। জোগাড়ে লেগে গেলাম। ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার। যাহা হোক, কোনো মতে কিছু জোগাড় করলাম, কাপড়-চোপড়ও কিছু জোগাড় হলো। দুই বৎসর আড়াই বৎসর জেলে থেকে কাপড় প্রায়ই ছোট হয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে হঠাৎ আতাউর রহমান সাহেব ফোন করলেন প্লেন ৮টায় আসবে, যথাসময় ৯টায় ছাড়বে। আমাকে খুঁজতে আতাউর রহমান সাহেব গেছেন, আর আমি খুঁজতে আসছি তাঁকে। তাঁর বাসায় খবর পেলাম প্লেন ছাড়ার সময়। তাড়াতাড়ি কমলাপুর চললাম মানিক ভাইকে আনতে, কারণ তিনি তো খবর জানেন না। যেয়ে দেখি মানিক ভাই বসে রয়েছেন, কোনো প্রস্তুতি নাই। উনি ঠিক করেছেন যাবেন না, কারণ টাকার অভাব; বিশেষ করে ইত্তেফাকের লেখা কে লিখবে, টাকার জোগাড় কে করবে? আপনারা বোধ হয় জানেন না, মানিক ভাই ইত্তেফাকের শুধু সম্পাদক নন, লেখক, প্রকাশক থেকে শুরু করে পিয়নও বটে। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ তাঁর প্রায় একলারই করতে হয়। অন্য কর্মীরা প্রায়ই জেলে, ওয়াদুদ বাইরে। ওয়াদুদের ওপর সমস্ত ভার দিলেন। আর খোন্দকার আবদুল হামিদের মতো ২/১ জনকে লেখা দিতে অনুরোধ করে রওয়ানা হলেন। আওয়ামী লীগ অফিসে এসে আতাউর রহমান সাহেবের সাথে দেখা হলো। আমরা তেজগাঁ অ্যারোড্রামের দিকে রওয়ানা হলাম, যেয়ে দেখি প্লেন প্রস্তুত; পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত। খুবই আনন্দিত হলাম, বিশেষ করে মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, আবদুল্লা মল্লিক ও অনেককে দেখে।

প্লেন ছেড়ে দিলো। ভাবলাম নূতন দেশ দেখব, কত আনন্দ! শুনে আরও খুশি হলাম রেঙ্গুনে বিকাল ও রাতে থাকতে পারবো বলে। সারা বিকাল আমরা রেঙ্গুন শহর দেখতে পারবো। প্রায় ২টায় রেঙ্গুন পৌঁছলাম। আমাদের বিরাট একটা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হলো। সুন্দর কামরা দেওয়া হলো। আমরা গোসল করে প্রস্তুত হলাম। আতাউর রহমান সাহেব তাঁর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় টাঙ্গাইলের আরফান খান সাহেবের ছেলে আজমল খাঁ,–ওখানে থেকে ব্যবসা করে–অনেক টাকার মানুষ ও পুরানা ব্যবসায়ী, সকলে জানে ও চেনে–তাকে ফোন করে দিলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি এলেন। তাঁর নিজের মটরগাড়ি আছে। সেই গাড়িতে করে প্রথমেই তাঁর রয়াল স্টেশনারি দোকানে নিয়ে গেলেন। বিরাট দোকান দেখে আনন্দ হলো। তাঁর কাছ থেকে শুনলাম নিজের চেষ্টায়ই তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তার বয়স ৩০/৩৫ বৎসর হবে। দেশি লোক পেয়ে অনেকদিন পরে সে আমাদের সাথে প্রাণ খুলে আলাপ করলো। দেশের কথা জানতে চাইল। আমাদের নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মদেশের খবর দিলো। তাঁর বাসায় নিয়ে গেল এবং স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। ভদ্র মহিলার চমৎকার ব্যবহার, নিজেই আমাদের খাওয়ালেন। তারপর ক্লাব, বৌদ্ধদের প্যাগোডাসহ সব ভালো ভালো জায়গা–আমাদের দেখালেন।

যতদূর খবর নিয়ে জানলাম, ব্রহ্মদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। বিপ্লবীরা বহুস্থান দখল করে আছে, আর মাঝে মাঝেই রেঙ্গুন শহরের পানি বন্ধ করে দেয়। আর একটা ভয়াবহ খবর পেলাম, 'ব্যান্ডিট'রা দিনে দুপুরে ডাকাতি করে। ভয়েতে দিনের বেলায়ও কেউ জানাশোনা মানুষ না হলে দরজা খোলে না।

আতাউর রহমান সাহেবের আর এক চেনা মানুষ, খুব নামকরা—রেঙ্গুনেই থাকেন, তিনি একজন ডাক্তার, তাঁর বাড়িতে আমরা যাই। তিনি বাড়ি ছিলেন না। অনেক ডাকাডাকি করলাম, দরজা খোলে না। দোতালার উপর থেকে ঐ দেশি এক মহিলা কথা বললেন। তাঁকে দরজা খুলতে বলা হলো, তিনি অস্বীকার করলেন। আমরা বললাম, একটু কাগজ দেন, একটা চিঠি লিখে রেখে যাই। তিনি বললেন, কাগজ দিতে হলে দরজা খুলতে হবে। তোমাদের চিনি না। পরে চিঠি লিখে তাকে নিতে বললাম, তিনি অস্বীকার করলেন। বললেন, "ওখানে ফেলে যাও, তোমরা চলে গেলে আমি কুড়াইয়া নিব।" আমরা আজমল খাঁ সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কী? তিনি বললেন, "এইভাবে ডাকাত দল বাড়িতে আসে তারপর হাত পাও বেঁধে সর্বস্ব নিয়ে চলে যায়। এটা দিনের বেলায় প্রায়ই হয়ে থাকে। পথের থেকেও টাকাওয়ালা লোক ধরে নিয়ে যায়। পরে টাকা দিলে ছেড়ে দেয়।"

যা হোক, এরপর প্যাগোডা দেখতে গেলাম। প্যাগোডা বৌদ্ধদের প্রার্থনা করার মন্দির। অনেক অর্থ দিয়ে গড়া বিরাট বিরাট মন্দির, দেখতে খুবই সুন্দর। ও দেশের লোকগুলি খুবই ধর্মভীরু বলে মনে হলো। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এক একটা মন্দির করেছে।

রাত্রে আমরা আমাদের রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের ঢাকার লোক, মিষ্টভাষী সন্দেহ নাই। আমরা যেয়ে দেখি ছবি দেখছেন, সে ছবি আমাদের রাষ্ট্রদূতের অফিস থেকে তোলা হয়েছে। প্রায় সকল ছবিই আমাদের রাষ্ট্রদূতের নিজের ও তার আত্মীয় পরিবার পরিজনের। কোথায় কবে খানা খেয়েছেন, কবে 'ব্যাঙকোয়েট' দিয়াছেন, ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রদূত অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলি রঙিন ছবি। কত টাকা খরচ করা হয়েছে, গোপনে খোঁজ নিতে চেষ্টা করলাম। অনেকে অনেক রকম বললো, মনে হয় যথেষ্ট খরচ হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত অনেক জাঁকজমকের সাথেই থাকেন, বিরাট অফিস ও বহু কর্মচারী তাঁকে সাহায্য করে। দেখে মনে হলো, যাদের টাকা দিয়া এত জাঁকজমক তাদের অবস্থা চিন্তা করলেই ভালো হতো। তাদের ভাতও নাই, কাপড়ও নাই, থাকবার মতো জায়গাও নাই। তারা কেউ না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। তাদেরই সামনে ছেলেমেয়েরা না খেয়ে তিলে তিলে মারা যায়। নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে আর খোদার কাছে ফরিয়াদ জানায়। জানি না খোদার কাছে সে ফরিয়াদ পৌঁছে কি না!

ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে যা কিছু শুনলাম ও বুঝতে পারলাম তার কিছুটা প্রকাশ করতে চাই। অনেকেই জানেন ওদেশে গৃহযুদ্ধ চলছে। যাকে আমরা অনেকেই 'বিপ্লব' বলে থাকি। কম্যুনিস্ট ও কারেন সম্প্রদায়ের লোকেরা যুদ্ধ করছে সরকারের বিরুদ্ধে, দেশকে নিজেদের দখলে নেওয়ার জন্য। উ ন্যু সরকারও তাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ চালাচ্ছে; কিন্তু ৫/৬ বৎসরেও বিদ্রোহীদের দমন করতে

পারছে না। তার প্রধান কারণ এটা একটি জঙ্গলময় দেশ। বিরাট বিরাট বন, পাহাড়; নদীর সংখ্যাও খুব বেশি। কখনও বিদ্রোহীরা সম্মুখ যুদ্ধে আসে না। গেরিলারা যুদ্ধ চালায়। হঠাৎ আক্রমণ করে গভীর বনে পালাইয়া যায়। কার সাধ্য তাদের খুঁজে পায়!

তবে বিদ্রোহীরা কিছু করতে পারছে না। এর কারণ কী? কারণ জনগণের সমর্থন ছাড়া বিপ্লব হয় না। সংগ্রামরত কম্যুনিস্টরা একটি সুবিধা পেয়েছে কারেন সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে। কারেন একটা জাতি। এরা ব্রহ্মদেশ সরকারের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে, কিন্তু সরকার তা দিতে অস্বীকার করায় তারা কম্যুনিস্টদের সাথে এক হয়ে বিপ্লব শুরু করে। জাপান যখন ব্রহ্মদেশ অধিকার করে তখন এরা বহু অস্ত্র জোগাড় করে। পরে সরকারের সাথে যুদ্ধে এইগুলি কাজে লাগায়। এখন ব্রহ্ম সরকার কারেনদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিতে রাজি আছে। কারেনদের যদি ব্রহ্ম সরকার হাতে নিতে পারে অথবা তাদের সঙ্গে একটা মিটমাট করতে পারে তাহলে কম্যুনিস্টরা বেশি দিন টিকতে পারবে না, হয় তাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে, না হয় দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

পূর্বেই বলেছি, জনসমর্থন ছাড়া বিপ্লব হয় না। কম্যুনিস্টদের জনসমর্থন তত নাই। কারণ, তারা মাঝে মাঝে রেঙ্গুন শহরের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যাকে তাকে ধরে নিয়ে টাকা আদায় করে, আর যে অঞ্চল তাদের অধিকারে যায় সেই অঞ্চলের জনগণের কাছ থেকে অর্থ ও খাদ্য আদায় করে। বোধ হয় গভীর জঙ্গলে থাকে তারা, তাই জোগাড় করতে পারে না খাদ্য ও অন্যান্য, যা তাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এটুকু জানবার সুযোগ হয়েছে আমার।

অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানেও অনেকের সাথে আলাপ হলো। ভোরেই আমাদের প্লেন ছাড়বে। তাই একটু ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। খুব ভোরে আমাদের প্লেন ছাড়লো। প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে আমরা ব্যাংককে পৌঁছলাম। সামান্য এক ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর আবার রওয়ানা হলাম হংকংয়ের দিকে। প্রায় ৪ ঘটিকার সময় আমরা হংকং পৌঁছলাম। যাবার সময় প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে আমাদের উড়োজাহাজ চললো, নিচে সমুদ্র। আমরা উড়ে চলেছি, মাঝে মাঝে মেঘ দেখলে মানিক ভাই ঠাট্টা করে বলতেন, "আবার বামপিং আসছে, খেয়েছে বাবা!" আমরা সাবধান হয়ে বসতাম। কারণ প্লেন মেঘের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় নিচের দিকে নেমে পড়ে, তাতে অনেকের দম নিতে কষ্ট হয়। কারণ মেঘের মধ্যে হাওয়া থাকে না।

হংকংয়ের কাছে যখন গেলাম তখন মনে হতে লাগলো, আহা দূর থেকে দেখতে কী সুন্দর দেশ! পাহাড়ের উপর থেকে আস্তে আস্তে একটা দেশ নিচের সমুদ্র পর্যন্ত নেমে আসছে, মধ্যে মধ্যে নদী। একটা বাড়ি অনেক উপরে, একটা বাড়ি অনেক নিচে। সমুদ্রের পাড়ে জাহাজ ভিড়ে আছে, কোনো কোনো

জাহাজ আবার ছেড়ে যাচ্ছে। আবার ছোট ছোট লঞ্চগুলি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

আমি লেখক নই, আমার ভাষা নাই, তাই সৌন্দর্যটা অনুভব করতে পারছি, কিন্তু গোছাইয়া লেখতে পারি না। পাঠকবৃন্দ আমায় ক্ষমা করবেন।

হংকংয়ের কোলন হোটেলে আমাদের রাখা হলো। কিছু সময়ের মধ্যে পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পীর সাহেব মানকী শরীফ, খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর, ফজলুল হক সায়েদা, মি. হানিফ এবং পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন নেতা পৌঁছালেন। তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ দলের মি. আবদুল কাইছুমও সদস্য ছিলেন। সেখানে বসে আমাদের নেতা ঠিক করা হলো। সকলে মিলে পীর মানকী শরীফকে পাকিস্তান ডেলিগেশনের নেতা এবং জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী ডেপুটি নেতা হলেন। কম্যুনিস্ট দেশে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে অধিকাংশই আমরা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন না। ভারতবর্ষ থেকেও কম্যুনিস্ট ছাড়া অনেকে বড় বড় কংগ্রেসী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ গিয়াছিলেন। আমরা আওয়ামী লীগের লোকসংখ্যায় বেশি হয়ে গেলাম; কম্যুনিস্টরা আমাদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে থাকে; আর মুসলিম লীগরা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন বলে গালমন্দ করে থাকে।

আমরা চা খেলাম। কাগজের রিপোর্টার এসে আমাদের ফটো নেওয়া শুরু করলো। আমরা হোটেলে এসে দেখলাম যার যার মালপত্র তার তার রুমে ঠিক করে রাখা হয়েছে। কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করে তাড়াতাড়ি আমরা হংকং শহর দেখতে বের হলাম। কিছু কাপড়-চোপড়ও আমাদের কিনতে হবে। আমরা আমাদের পাকিস্তানি টাকা পরিবর্তন করে হংকং ডলার করলাম। হংকংয়ে বহু দোকান দেখলাম সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুদের। আমাদের পেয়ে তারা খুব খুশি হলো। তাদের দোকান থেকেই আমরা মালপত্র কিনলাম। তারা আমাদের কাছে দেশের কথা জানতে চাইলো। তারা বললো, "আমরা পাকিস্তানি, দেশে ফিরে যেতে পারবো কি না? আমাদের আত্মীয়স্বজন সকলেই হিন্দুস্তানে চলে এসেছে। বাড়িঘর বোধ হয় নাই।" অনেক প্রশ্ন করলেন। আমরাও তাদের সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, দেশ সকলের, আপনারা ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আপনাদের ঘরবাড়ি ফিরে পাবেন। এক দোকানদারের একটা যুবক ছেলে ছিল। সে দোকানেই থাকতো। আমার সাথে আস্তে আস্তে আলাপ করা শুরু করলো। জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কম্যুনিস্ট? বললাম, না। আমাদের স্বতন্ত্র দল আছে, দলের নাম তাকে বললাম এবং বললাম আমাদের প্রোগ্রাম আছে, মেনিফেস্টো আছে। আমাদের দলের নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। আইন করে কারও কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্য আমাদের দলের নাই। আমরা দেশের সম্পদ এবং ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ দিয়ে দেশ গড়তে চাই। ভাড়া করে কোনো আদর্শ আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। আবার মিছামিছি কোনো আদর্শকে

লোকের চোখে হেয় করতেও চাই না। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাস করি।" সে অনেক কিছু জানতে চাইল, যতটুকু উত্তর দেওয়া যায় দিলাম। যেখানে দেওয়া যায় না, হ্যাঁ, না বলেই শেষ করে দেই। কারণ দেশের ভিতরে আমাদের সরকারের অন্যায়-অত্যাচার সম্বন্ধে বললেও বিদেশে বলার পক্ষপাতী আমরা নই। কারণ এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে মনে করি।

যাহোক, ভদ্রলোক যখন দেখলো আমি কম্যুনিস্ট না এবং আমার কথায় যখন তার বিশ্বাস হলো, তখন সে আমার সাথে প্রাণ খুলে আলাপ করতে আরম্ভ করলো। ভদ্রলোক কট্টর কম্যুনিস্ট বিরোধী।

তিনি আমাকে নয়াচীন সম্বন্ধে অনেক আজগুবি গল্প বলতে শুরু করলেন। বিশেষ করে এ কথা বললেন যে, "নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে অনেকের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, অনেককে ফাঁসি দিয়েছে, অনেককে গুলি করে হত্যা করেছে। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে হংকংয়ে পালিয়ে এসেছে। আজ তাদের দুর্দশার সীমা নাই।" বুঝলাম, লোকটা ভাবপ্রবণ। সামান্যতে কাতর হয়ে পড়েছে। আজকের রাজনীতির যে এটা ধারা–যে যখন ক্ষমতায় আসে তখন বিরুদ্ধ পার্টির ওপর অত্যাচার চালায়। যেমন, রাশিয়ায় ম্যালানকভ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে স্ট্যালিনের প্রধান কমরেড রাশিয়ার ১০ বৎসরের হোম মিনিস্টার, লোনাভর, রাতারাতি রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে গেলেন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হলো। আবার আমেরিকায় কম্যুনিস্ট মত পোষণ করে বলে অনেক আমেরিকানকে জেলে পচে মরতে হচ্ছে। এমনকি রোজেনবার্গ দম্পতিকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। যাক, তিনি আমাকে অনেক করুণ কাহিনি শোনালেন। আমি ভাবলাম কিছুটা সত্যই হতে পারে। তিনি আরও আমায় বললেন, দেখেন যারা নয়াচীনে যায় যাবার সময় একরকম থাকে আর ফিরে আসার সময় আর এক রকম হয়ে যায়। আমি বললাম, বুঝাইয়া বলুন। তিনি বললেন, ওখান থেকে ফিরে যখন আসে তখন নয়াচীন সরকার ও জনসাধারণের খুব প্রশংসা করে। আবার বললো, এর কারণ জানেন? ওখানে গেলে সুন্দর সুন্দর মেয়ে আপনাদের কাছে আসবে, আপনাদের সকল সময় মুগ্ধ করে রাখবে। কিছু দেখতে দেবে না এবং আদর করবে এত বেশি যে আপনারা দুনিয়া ভুলে যাবেন।

আমি ভাবলাম, লোকটা অন্ধ। আমরা রাজনীতি করি, আমাদের লোভ মোহ দিয়া ভোলানো সোজা না। তাহলে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগওয়ালারা তা পারতো। মনে মনে ভাবলাম, "জেলে দিয়া, মিথ্যা মামলার আসামি বানিয়ে, ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কৃত করে নানা প্রকার অত্যাচার করেও আমাদের মতের পরিবর্তন করা যায় নাই।" দেখা যায়, হংকং-এ থেকে কম্যুনিস্ট বিরোধী হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ, চীনের অনেক বড় বড় লোক কমিউনিস্ট জুজুর ভয়ে হংকং-এ আশ্রয় নিয়েছে। তবে আস্তে আস্তে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছে। অনেকে আবার হুজুগে এসে বিপদে পড়েছে। এইভাবে, বহুলোক

হংকংয়ে সামান্য জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। যাহোক, ফেরার পথেও দুইদিন হংকংয়ে ছিলাম, তাই হংকং পর্ব শেষ করে নয়াচীনে ঢুকবো।

হংকং ইংরেজ কলোনি, ইংরেজই শাসন চালায়, তবে হংকংয়ের বাসিন্দাদেরও প্রতিনিধি থাকে। একদিকে বিরাট বিরাট দালান কোঠা আর ব্যবসা বাণিজ্য, আর একদিকে লক্ষ লক্ষ গরিব রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করছে। সকলের চেয়ে বড় আয় নারী ব্যবসায়। তাই দিয়েই বহুলোক সংসার চালায়।

দুনিয়ার অন্যতম সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ শহর বলে বহু লোক এখানে বেড়াতে আসে। যার কারণে ইংরেজদের ব্যবহার খুব ভালো। মিছামিছি লোককে হয়রানি বা পেরেশান করে না। তাদের ব্যবহার ও গণতন্ত্রের জন্য মানুষ হিসেবে ইংরেজ জাত শ্রেষ্ঠ, যদিও আমার এটা ব্যক্তিগত মত।

আতাউর রহমান সাহেব, মানিকভাই, ইলিয়াস ও আমি রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ ১৬/১৭ বৎসরের একটা মেয়ে আতাউর রহমান সাহেবের কোটে একটা গোলাপ ফুল লাগাইয়া দিতে অগ্রসর হয়। মেয়েটি কলারে হাতও দিয়াছে, খান সাহেব হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠলেন। পরে ধাক্কা দিয়া ফুল ছুড়ে ফেলে রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে এগিয়ে চললেন। মেয়েটা আশ্চর্য হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের মতো যুবকদের দিকে নজর না পড়ে আপনার ওপর পড়ার কারণ কী? আতাউর রহমান সাহেব তো রাগে অস্থির, আর মানিকভাই তো তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চের' মতো ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ওনার পিছনে লাগলেন। আমরা খুব হাসাহাসি শুরু করলাম। বেচারা ভদ্রলোক রাগে শোকে দুঃখে কথা বলেই যেতে লাগলেন।

হংকংয়ে ফুল দেওয়াটা হলো 'প্রেম নিবেদন।' ফুলটা গ্রহণ করলেই ওরা মনে করবে আপনি তার সাথে যেতে রাজি হয়েছেন। আপনাকে হাত ধরে সাথে করে ওদের জায়গায় নিয়ে যাবে। বেচারি ভেবেছিল, আমাদের দলের নেতা মোটাসোটা ভালো কাপড় পরা, গম্ভীর প্রকৃতির–টাকা-পয়সাও নিশ্চয় যথেষ্ট আছে। ঠিকই ধরেছিল কিন্তু বেচারি জানে না, আমাদের নেতা নীরস ধর্মভীরু মানুষ, 'আল্লাহ আল্লাহ' করেন আর তাঁর একমাত্র সহধর্মিণীকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসেন। এ সবদিকে খেয়াল দেয়ার মতলব ও সময় তাঁর নাই। তবে এই মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ কী? এই সমাজব্যবস্থা। বাঁচবার জন্য এরা সংগ্রাম করছে, ইজ্জত দিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করছে। হায়রে মানুষ! রাস্তায় রাস্তায় বহু মেয়েকে এইভাবে হংকং শহরে ঘুরতে দেখা যায়, অধিকাংশ চীন দেশের মোহাজেরান। জুজুর ভয়ে হুজুগে এসে এখন ফিরে যেতেও পারে না, আর কাজ করে যে খাবে সে ব্যবস্থাও নাই। অনেক দুঃখে দিন কাটছে ওদের। দেশের মালিক ইংরেজ, জনগণ না। ইংরেজ জাত, যে যায় তাকে আশ্রয় দেয়, তাই এত যুদ্ধের পরেও জাতটা বেঁচে আছে আর থাকবেও। আমাদের সাথে অনেক ইংরেজের দেখা হলো, আলাপ হলো। যখন শুনলো

আমরা পাকিস্তানি, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একটা দেশ, খুব খাতির করতে লাগলো। ভালো ব্যবহারও করলো। এবং অনেক বিষয়ে আলাপ করলো। চীন দেশে যাবো শুনে আমেরিকানদের মতো আঁতকে উঠল না। একজন বললো, বহুদিন পরে চীন দেশে একটা সত্যিকারের সরকার কায়েম হয়েছে। এখন চীন দেশে আইন শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

হংকংয়ে না পাওয়া যায় এমন কোনো জিনিস নাই। মালপত্র খুব সস্তা। সেখানে জিনিসের দামের ওপর ট্যাক্স না বসানোর জন্য জিনিসপত্র খুবই সস্তায় পাওয়া যায়–বিশেষ করে কাপড়, ঘড়ি, পেন এবং নানাবিধ 'কনজুমার্স গুড'স। পাকিস্তানি টাকার ছয় টাকায় যে হাওয়াই শার্ট পাওয়া যায় তার দাম আমাদের দেশে ৩০ টাকা। যে গরম জ্যাকেট আমি এনেছিলাম পাকিস্তানি টাকার মূল্যে ২৪ টাকায় তার দাম আমাদের দেশে কমপক্ষে ১০০ টাকা। যে স্যুট আমি ও আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যরা ৬০ টাকায় বানাইয়া আনি, তার দাম কমপক্ষে আমাদের দেশে ২০০ টাকা। অন্য জিনিসের দাম আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন এই পরিমাণে কম হবে। ঘড়ি ও পেনের দাম আমাদের দেশে হংকংয়ের থেকে ডাবল হবে। তবে, সেখানে খাদ্যের দাম প্রায় আমাদের দেশের মতোই। খাবার বিদেশ থেকে আনতে হয়। কারণ হংকং চীন দেশের মেইনল্যান্ডের পাশে ক্ষুদ্র একটা দ্বীপময় স্থান। যথেষ্ট খাবার হতে পারে না, কেননা লোকসংখ্যা খুবই বেশি। চোর ডাকাত খুব বেশি নাই। ইংরেজ সেটা দমন করেছে, তবে ৪২০-এর আমদানি কিছুটা বেশি। নতুন মানুষ দেখলে কিছুটা চেষ্টা করে বই কি! তবে আমাদের ওপর চালাতে পারে নাই। কারণ আমরা হুঁশিয়ার ছিলাম।

রাত প্রায় ৯টায় আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। আমি ও ইলিয়াস এক রুমে ছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে খুব আরামে ঘুম হলো, কারণ ক্লান্ত ছিলাম।

সকালে উঠে আমরা গোসল করে প্রস্তুত হলাম, কারণ নয়াচীনে রওয়ানা করবো। আমাদের সকালেই খবর দিয়ে যাওয়া হলো। শান্তি কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আমাদের সকল কিছু দেখাশুনা করতে লাগলো। সকাল ৯টায় আমরা কোলন রেল স্টেশনে উপস্থিত হলাম। আমাদের মালপত্র পূর্বেই স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যেয়ে দেখি মালপত্র ট্রেনের কামরায় উঠে যাচ্ছে। ট্রেনগুলির কামরা আমাদের দেশের কামরার মতো না। দুইটা করে সিট, একটা বেঞ্চ (Bench)–গদি দেওয়া, আমরা উঠে পড়লাম। কিছু সময় পরে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

নয়াচীন ও হংকংয়ের সীমানায় এলাম। ছোট একটা খাল দ্বারা ভাগ হয়েছে। আমরা ইংরেজের জায়গায় নামলাম। ছোট স্টেশন, অনেক বই পাওয়া যায়। আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করা হলো। ভিসা এনে দেয়া হলো। আমাদের জন্য দোভাষী ঠিক করাই ছিল, যথাসময়ে এসে হাজির। আমাদের শরবত খাওয়ালো। আমাদের মালপত্রের জন্য চিন্তা নাই, চীনের শান্তি সেনারা (শান্তি কমিটির

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী) তার দেখভাল করেছে। পরীক্ষা করে ইংরেজ সীমানা থেকে চীন সীমানার পূর্বে নিয়ে গিয়েছে। সব মিলে এসে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগলো।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ পরে দোভাষী এসে আমাদের জানালো, এবার আপনারা রওয়ানা করুন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সকলই ঠিক হয়ে গেছে। একটা পুল পার হয়ে নয়াচীনে ঢুকতে হবে। পুলটার অর্ধেক হংকংয়ের, অর্ধেক নয়াচীনের। দু'পাশেই বন্দুকধারী প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। আমরা আবার ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেন ছেড়ে দিলো। আমরা ক্যান্টন শহরে যাচ্ছি। এই শহরটা খুবই সুন্দর, অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে লাল চীন সৈন্যবাহিনী এই শহর দখল করে এবং চিয়াং কাইশেক ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

আমরা ট্রেনে কিছু খেয়ে নিলাম। ফলের জোগাড় যথেষ্ট তারা করেছে। এই সময়ে মানিক ভাইয়ের কথা সামান্য লেখা দরকার। "মানিক ভাই ভালো লেখতে পারেন, কিন্তু এত যে খেতে পারেন তা আগে জানতাম না। সমানে খেতে শুরু করলেন, মনে হলো প্রায় ২/৩ ঘণ্টা খেয়েই চললেন। জিজ্ঞাসা করলাম, মানিক ভাই পেটে হলো কী? বললেন, দুর্ভিক্ষ হয়েছে।" মানিক ভাই দোভাষীকে নিয়ে বসলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আর খাওয়ার পরে খাওয়া চললো। মানিক ভাইয়ের স্মরণশক্তি অস্বাভাবিক, নোট করতে হয় না। কেমন করে সব কিছু মনে রাখেন বুঝতে পারি না। যা হোক, আমিও একটি মাস্টারকে নিয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না, দোভাষী তার কথা আমাকে বুঝাইয়া দেয়, আমার কথা তাঁকে। আলোচনাটা পরে উল্লেখ করবো।

রেলগাড়ির কথা বলি। কম্যুনিস্ট দেশ বলে সকল সমান হয়ে যায় নাই। ট্রেনে দু'রকম ক্লাস আছে, 'নরম ক্লাস আর শক্ত ক্লাস।' ভাড়ায়ও ব্যবধান আছে। প্রায় দু'গুণ। একটায় গদি আছে আর একটায় গদি নাই। হেলান দিয়ে দু'জন করে বসতে পারে বেঞ্চিতে। রাতে ঘুমাবার বন্দোবস্ত আলাদা রুমে হয়। সেখানেও দিনে থাকা যায়। নরম ও শক্ত ছাড়া সুবিধা প্রায় সমান। প্রত্যেক গাড়িতে লাউড স্পিকার ঠিক করা আছে, পথে পথে গান চলে। সাবধান হয়ে বসবার জন্য এবং ময়লা বা নোংরা না করবার অনুরোধ করে। বড় বড় নেতাদের রেকর্ড করা বক্তৃতা শোনানো হয়। কোনো খবর থাকলে বলা হয়। আর স্টেশনের নিকটে আসলে ১৫ মিনিট পূর্বেই বলে দেওয়া হয়, সামনে অমুক স্টেশন। যাত্রীদের তাতে খুবই সুবিধা হয়। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে হয় না। অনেক সময় ঘুমাইয়া থাকার জন্যে অথবা নতুন মানুষকে জানতে না পেরে স্টেশন পার হয়ে চলে যেতে হয় না। এমনি প্রত্যেক স্টেশনে বলে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে এসে কামরাগুলি পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। কোনো ময়লা পড়ে থাকলে মুছে নিয়ে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে খুবই খেয়াল। গাড়িতে খাবার ঘরও আছে। যাদের খাওয়ার দরকার খেয়ে নেয়। টিকিট চেকার সাহেব মাঝে মাঝে

ঘুরে যান। তবে যতদূর জানলাম বিনা টিকেটে কেহ ভ্রমণ করে না। একজন টিকিট চেকার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দোভাষীর মাধ্যমে–আপনি টিকিট ছাড়া লোক কতদিন দেখেন নাই? সে বললো, প্রায় দেড় বৎসর। তবে যদি গাড়ি ছাড়বার সময় তাড়াতাড়ি উঠতে হয়, তবে পরের স্টেশনে আমাকে খবর দেয় আমি টিকিট দিয়ে আসি। আজকাল আর আমাদের টিকিট চেক করতে হয় না, কারণ কেহই বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠে না। আর ফাঁকি দিতেও চেষ্টা করে না। তারা মনে করে এ পয়সা তাদের নিজেদের, রাষ্ট্র তাদের, গাড়ি তাদের, নিজেকে ফাঁকি দিয়া লাভ কী? তবুও সে বললো অন্যান্য লাইনে ২/১টা ঘটনা এখনও আছে, তবে ধরা পড়লে যাত্রীর দলই তাকে এমন শায়েস্তা করে, জীবনেও ভুলবে না। আর সরকারও ভীষণ শাস্তি দেয়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি চিয়াং কাইশেকের সময় চাকরি করতেন? উত্তর, হ্যাঁ। তবে এরা আপনাকে রাখলো কেন? তিনি বললেন, আমরা অনেকেই আছি বিশেষ করে যারা ঘুষ খেতাম না। ঘুষ যারা খেতো তারা অনেকে পালিয়ে গেছে। আমাদের পূর্বেই ইউনিয়ন ছিল। আমি ইউনিয়নের সদস্য ছিলাম গোপনে। আমরা ইউনিয়নের সদস্য হয়েছি একথা জানলে চিয়াং কাইশেকের দল আমাকে তাড়াইয়া দিত, না হয় জেলে দিত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি মনে করেন, চোরের দল পালাইয়া গেছে আর যারা সাধু বলে পরিচিত তারা আছে?" তিনি উত্তর করলেন, "এ কথা আপনি বলতে পারেন। তবে যারা সত্যবাদী, ঘুষ খায় না, দেশকে ভালোবাসে ও কর্মঠ তারা আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বেতন কত পান?" উত্তর দিলেন, "বেশ পাই, চলে যায়। চিয়াং কাইশেক আমলের চেয়ে বেশি পাই। থাকবার জায়গা পাই। অনেক সুবিধা আছে। তবে তাড়াতাড়ি তো কিছু হয় না, সময় দরকার।" আমি আর বাড়াবাড়ি করলাম না। কারণ বেচারাও আমার সাথে আর আলাপ করতে চান না–ভাবেসাবে বুঝলাম। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, বোধ হয় আপনার কাজ আছে, আচ্ছা ধন্যবাদ। তিনি চলে গেলেন আমাকেও একটা ধন্যবাদ দিয়ে। দোভাষীকে বললাম, চলুন আমাদের কামরায়। যেয়ে দেখি কেহ কেহ ঘুমাচ্ছে। কেহ কেহ আলাপ করছে। ইলিয়াস এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করছে, ওটা জিজ্ঞাসা করছে। ওর জানবার আকাঙ্ক্ষা দেখে মনে হলো বোধ হয় এই মুহূর্তেই নয়া চীনের সকল বিষয় জেনে নিতে চায়।

আমি বাহিরের দিকে চেয়ে দেশটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। মনে হলো এতো আমার পূর্ব বাংলার মতো সকল কিছু। সবুজ ধানের ক্ষেত, চারদিকে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে মাটির ঘরের গ্রাম, ছোট ছোট নদী, ট্রেনটা পার হয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার কোদাল দিয়া জমি ঠিক করছে। বেশ লাগছে দেশটা। পরে চা খেলাম, দুই রকমের চা হাজির করলো। একরকম চা আমরা খেয়ে থাকি, দুধ চিনি দেয়া। আর এক রকম যাহা চীনের লোকরা খেয়ে থাকে,

দুধ চিনি ছাড়া শুধু পাতার চা। সাথে কিছুটা হলদে হলদে কাঁচা পাতা দিয়ে করা, খেতে বেশ লাগলো। খুব উপকারী শুনলাম। আমি ওদের দেশের যে চা খেলাম তার নাম 'চিং চা।'

সন্ধ্যায় আমরা ক্যান্টন পৌঁছালাম। ট্রেন যখন থামলো তখন প্ল্যাটফরম ভর্তি মানুষ। বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে ফুলের তোড়া, স্লোগান দিচ্ছে। বুঝতে পারলাম না কী বলছে। দোভাষীও দূরে রয়েছে। শুধু শুনলাম তিন কি চারটা কথা সকলে বলছে। আমাদের অভ্যর্থনা করলো ক্যান্টন শান্তি কমিটির সভ্যবৃন্দ। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে ছুটে এলো আমাদের পাশে, একজন একজনের হাত ধরলো আর তার ফুলের তোড়াটা আমাদের হাতে দিলো।

আমাদের হাত ধরে নিয়ে চললো। কোনো সংকোচ নাই, আমরা যেন তাদের কত আপন, কতকালের পরিচয়। চোখে মুখে আনন্দ ধরে না। আমরাও ওদের স্নেহ করতে লাগলাম, কিন্তু দুঃখ, ওদের ভাষা আমরা বুঝি না। ওরা আমার ভাষা বোঝে না। শুধু গায়ে হাত দিয়ে বাচ্চাদের আদর করতে লাগলাম। সমস্ত বাচ্চা সুন্দর, চেহারার ভিতর পরিবর্তন, কত আশা তাদের মনে। ছেলেমেয়ে সকলের একই রকমের প্যান্ট ও শার্ট পরা, গলায় লাল রুমাল। পায়ে হাফ স্টকিং, সাদা জুতা। আমাদের সাথে সাথে গাড়ি পর্যন্ত এলো, গাড়িতে তুলে দিয়ে তারা সরে দাঁড়াল; বোধ হয়, জায়গা কম তাই তারা এলো না। আর একটা বাস বোঝাই করে আমাদের সাথে সাথে হোটেলে এলো। রাত তখন প্রায় ৮টা। সেখানেও আমাদের অভ্যর্থনা করলো। শুধু স্লোগান আর স্লোগান, আমরা হোটেলে রুম পেলাম। যার যার রুমে মালপত্র কখন এসে গেছে জানি না। রুমে যেয়ে দেখি আমার পুরান সুটকেসটা ঠিকই আছে। বিছানাটাও করা রয়েছে। চট করে হাত মুখ ধুয়ে দোভাষীকে ডেকে পাঠালাম। দোভাষী এলো, তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, স্লোগানগুলি কী?

সে বললো, "দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক, মাও সে তুং–জিন্দাবাদ, নয়াচীন–জিন্দাবাদ।"

এ কয়টা কথা শিখে নিলাম, চীনাভাষায় আমি বলতে পারতাম। ভাবলাম, বহু জায়গায় যেতে হবে। আমাদের যখন ওরা অভ্যর্থনা করবে আমিও ওদের কথার উত্তর ওদের ভাষায় দিবো, যদিও এই কথা কয়টাই আমার চীনা ভাষার পাণ্ডিত্য। কিছু সময় পরে ক্যান্টন শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো, পীর মানকী শরীফ, জনাব আতাউর রহমান ও আরও কয়েকজন এক টেবিলে বসলেন। তাঁদের সাথে প্রাদেশিক ক্যান্টন শান্তি কমিটির সভাপতিও বসলেন। তিনি ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। তিনি প্রথমেই বক্তৃতা করতে উঠলেন, দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হোক, পাকিস্তান বেঁচে থাকুক, আমাদের বন্ধুত্ব

অটুট হোক, পাকিস্তান ও চীন শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করুক, যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক। আমরা শান্তি সম্মেলনে আছি, অনেক কষ্ট হবে, দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আমাদের স্বাধীনতা কিছুদিন হলো পেয়েছি। আপনাদের ভালোভাবে যত্ন করতে পারলাম না। অনেক কিছু বললেন, আমি অল্প কথায় শেষ করলাম। তিনি চীনা ভাষায় বক্তৃতা করলেন। দোভাষী আবার ইংরেজিতে বলে দিলেন। পীর সাহেবকে উর্দুতে একজন বুঝাইয়া দিলেন। পীর মানকী শরীফ আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দিতে উঠলেন। অল্প কথার মধ্যে ভালোই বললেন। তাদের আতিথেয়তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানালেন।

আমাদের খাওয়া চললো। চীনদেশের ডিনার। আমরা মুসলমান বলে আমাদের যে যে জিনিস খেতে নিষেধ আছে তাহা বাদ দিয়ে করা হয়েছে; মুরগি, ডিম, তরিতরকারি, চিংড়ি মাছ ও অন্যান্য মাছও ছিল। আমাদের যা যা ভালো লাগলো খেলাম। তারপর অনেক গল্প চললো। তারাও আমাদের দেশের খবর জানতে চায় আর আমরাও তাদের খবর জানতে গিয়েছি।

একটা কথা এখানে বলে নেয়া ভালো। আমরা হংকং থাকতে সভা করে ঠিক করে নিয়েছিলাম, আমাদের দেশের ভিতরের খবর কেহ সভায় বলবো না এবং আলোচনা করবো না। আমাদের দেশের মুসলিম লীগের শাসনের কথা যদি বলি তবে দুনিয়া হাসবে। কারণ, মুসলিম লীগের গণতন্ত্রের যে রূপ তা কোনো সভ্য সমাজে না বললেই ভালো হয়। কারণ, তাতে পাকিস্তানের ইজ্জত যাবে।

ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমার টেবিলে বসেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লাল চীন বাহিনী যখন ক্যান্টন অধিকার করে তখন অবস্থা কী ছিল, বিশেষ করে জনসাধারণের মনোভাব কী ছিল? শহরের বা শিল্পের কোনো ক্ষতি করে গিয়েছে কি না? বিশেষ করে যখন চিয়াং কাইশেক সৈন্য লইয়া পশ্চাদপসরণ করেন? ছাত্রটি ইংরেজি জানে। সে বললো, "চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনী কোনো জিনিসই নষ্ট করে যায় নাই। অনেক বড়লোক এবং বড় কর্মচারী, তাহার সাথে পালাইয়া গিয়াছে। যে যাহা পারে নিয়া গিয়াছে, আর অন্য সকল জিনিসপত্র রেখে গিয়াছে। নয়াচীনের সৈন্যবাহিনী যখন শহরে এলো, আমরা ৫/৭ দিন ভয়েতে দরজা খুলি নাই। ভাবতাম বুঝি অত্যাচার করবে, কারণ অনেক অত্যাচারের কাহিনি আমরা শুনেছি। কিন্তু দেখলাম এরা এসেই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে শুরু করলো। একদল চিৎকার করে বলতে বলতে গেল, 'তোমরা নির্ভয়ে কাজ কর্ম করো, দোকান খোলো, ব্যবসা বাণিজ্য চালাও। ঘরের বাহির হও। কোনো ভয় নাই। আমরা তোমাদের ভাই, তোমাদের সেবাই আমাদের কাজ।' আস্তে আস্তে দোকান খোলা শুরু হলো, লোক রাস্তায় বেরুতে লাগলো। অনেকে সৈন্যবাহিনীদের খাবার সাহায্য করতে চাইলো। তারা গ্রহণ করলো না, যারাই বাহির হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করে। এসব দেখে ছয় দিন পরে আমরা দরজা খুললাম"—ছেলেটা আমাকে বললো।

ছাত্রটি আরও বললো, ‘আমি আস্তে আস্তে ওদের কাছে গেলাম, ওরা খুব ভালো ব্যবহার করলে আমার মনে সাহসের সঞ্চার হলো। আমরা কয়েকজন ছাত্র এক জায়গায় হলাম। দেখলাম কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীরা বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিচ্ছে কী দরকার, কোনো অসুবিধা আছে কি না? কী সাহায্য করতে পারি? এ সৈন্য জনগণের সৈন্য। এরা জনগণের অংশ। ৭/৮ দিন পরে পূর্ণ নাগরিক জীবন ফিরে এলো। শহরে শান্তি রক্ষা ও অন্যান্য কাজের জন্য একটা নাগরিক কমিটি গঠন করে দিলো। যদিও তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই কম্যুনিস্ট অথবা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন ও কয়েকজন শিক্ষক এবং সম্মানি লোক। এদের অনেকের ওপরই জনসাধারণের শ্রদ্ধা ছিল। এদের কাজকর্ম, ব্যবহার দেখে আমিও এদের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। ওরা সমস্ত লোকদের ডাক দিলো, এসো, আমরা শহর পরিষ্কার ও অন্যান্য সমাজসেবার কাজ করি। কত বেকার, কত দুঃখী, তাহার হিসাব নেওয়া শুরু করলো, নানা প্রকার গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করলো, লোকের মনে শান্তির ছায়া ফিরে এলো। সকলেই তাদের ডাকে সাড়া দিলো। কেহ ভালোবেসে, আবার কেহ ভয়ে ভয়ে।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো লোককেই কি গ্রেপ্তার করা হলো না? সে বললো, যারা চিয়াং কাইশেকের দলে অথবা তাহাকে খুব সমর্থন করতো তারা পালাইয়া গিয়াছে। আর যদি কেহ কোনো লোকের বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে পারে যে সে চিয়াং-এর আমলে অত্যাচার করেছে, ব্ল্যাক মার্কেটিং করেছে এবং খারাপ কাজ করেছে তাকে গ্রেফতার করা হতো। আমার মনে হলো ছেলেটা একটু চেপে গেলো, কারণ কিছু লোককে তো নিশ্চয়ই গ্রেফতার করা হয়েছে–যারা সরতে পারে নাই আর ভাবছে তাদের কাজ কর্ম নয়াচীন সরকার জানতে পারে নাই।

আমরা রাত প্রায় ১০টায় রুমে ফিরে এলাম এবং যার যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সকাল পর্যন্ত খুব আরামে ঘুমালাম। উঠে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কাপড় পরলাম। কারণ আমাদের রওয়ানা হতে হবে পিকিংয়ে, যেখানে আমাদের শান্তি সম্মেলন হবে। নয়াচীনের রাজধানী পিকিং শহরে ক্যান্টন থেকে যেতে রেলগাড়িতে দুই দিন দুই রাত লাগে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে বলে আমাদের জন্য অ্যারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সকাল ৯টায় অ্যারোপ্লেন ছাড়বে।

আমরা যে হোটেলে ছিলাম তা নদীর পাড়ে চারতলা একটি দালান, লিফটের বন্দোবস্ত ছিল। হোটেলের দুই পাশ দিয়ে নদী। বড় বড় নৌকা নদীর পাড়ে থেমে আছে। এরা আমাদের দেশের মতো মালপত্র আনা নেওয়া করে। ৮টার সময় আমরা চা-নাস্তা খেলাম, তারপর সকলে মোটরে উঠে অ্যারোড্রাম-এ পৌঁছলাম। আমাদের জন্য ছোট দুইটা প্লেন জোগাড় করে রাখা ছিল। আমরা ভাগ ভাগ হয়ে উঠে পড়লাম। যাবার সময় আবার আমাদের তারা প্রাণভরে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

প্লেনগুলি ছোট হলেও বেশ আরামদায়ক। ২১ জনের বসবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত প্লেনের মধ্যেই ছিল। আমরা মাঝে মাঝে চা ও শরবত খেতে খেতে বেলা ৫টার সময় পিকিং অ্যারোড্রামে পৌঁছলাম। সেখানেও আমাদের অভ্যর্থনা করা হল, বাচ্চা বাচ্চা ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের ফুলের তোড়া উপহার দিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের জনাব মাজাহার—লাহোরের দৈনিক পাকিস্তান টাইমস কাগজের সম্পাদক, পূর্বেই পিকিং পৌঁছেছিলেন। তিনিও আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখে আমরা খুব আনন্দিত হলাম। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা আমরা গিয়াছি তার মধ্যে আমার সাথেই তাঁর পরিচয় ছিল।

আমাদের অ্যারোড্রামেই চা খাওয়ান হলো। তারপর গাড়িতে চড়ে আমরা পিকিং শহরে চললাম। দুনিয়ার নামকরা এই শহর। বহু ঝড় গিয়াছে এর ওপর দিয়ে। বহু রাজার রাজধানী ছিল এই শহর। বহু বিদেশি এই শহরটি অনেকবার অধিকার করেছে। শেষবারের মতো জাপানিরা এই শহরটা অধিকার করে—যখন চীন-জাপান যুদ্ধ হয়। তারপর চিয়াং কাইশেকের হাতে ছিল। শেষে, নয়াচীন সরকার মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে এই শহরটা অধিকার করে রাজধানী কায়েম করে। দেখবার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে চললো, মনে হলো কখন পৌঁছব, আর তো দেরি সয় না! সন্ধ্যা হবে হবে এমন সময় আমরা পৌঁছলাম। আমাদের জন্য কামরা ঠিকই ছিল। পিকিং শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেল—যার নাম 'পিকিং হোটেল' সেখানে আমাদের রাখা হলো। ভারত থেকে যারা যোগদান করতে গিয়াছেন তারাও ঐ হোটেলে আছেন। হোটেলটা পাঁচতালা, খাবার ব্যবস্থা উপর তলায় বন্দোবস্ত। আরও অনেক দেশের ডেলিগেটরা এই হোটেলে ছিলেন। পীর মানকী শরীফকে এক রুম দেওয়া হয়েছে। আর প্রায় সকলেই দুইজন করে এক রুমে। আমরা ইচ্ছা করেই তিনজন এক রুম নিলাম। আতাউর রহমান সাহেব, মানিক ভাই ও আমি। আমাদের কামরায় আমাদের মালপত্র হাজির। যার যার বিছানায় বসলাম।

রাত্রে আমাদের পাকিস্তান ডেলিগেটদের সভা হবে, খাবার পরেই। পীর সাহেব বলে দিয়াছেন মুসলমানের পাক খাবেন, তাই আমাদের জন্য এক মুসলমান হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। রাত্রে সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে অভ্যর্থনা করলো। আমরা 'ওয়া লাইকুম আস্ সালাম' বলে উত্তর দিলাম। তাদের সাথে গল্প শুরু করলাম, "মনে রাখবেন দোভাষী আমাদের সাথে আছে, না থাকলে আমরা বোবা।"

আমাদের টেবিলে সাংহাই-এর দৈনিক ইংরেজি খবরের কাগজের সম্পাদক বসলেন। তিনি আমাদের কথা ওদের বুঝায়ে দেন। আবার ওরা যা বলে তাহা আমাদের বুঝায়ে দেন—এক কথায় তারা বললো, আমরা খুব ভালো আছি।

এখন আর অত্যাচার হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয় না। পরে আলোচনা করা যাবে। খাবার যখন আমাদের সামনে হাজির করা হলো তখন আমাদের অবস্থা কাহিল। কী করে এগুলি খাব! পাক প্রায় সকল সম্প্রদায়ই নিজেদের মতো করে। কেহ গরু খায়, আর কেহ শুয়োর খায়। আমাদের জন্য গরুর গোস্তের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু খেতে পারলাম না। যা খেলাম তার জন্য সারারাত পেটে তেল লাগাতে হলো। মাঝে মাঝে পেটের ভিতর গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শুরু করতে আরম্ভ করলো, আর চাপা চাপা বেদনা শুরু হলো। যাহোক, ফিরে এসে টেবিলের উপর দেখি কিছু ফল আর সিগারেট। ফল ও সিগারেট খেয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে রাত কাটলো। আমাদের কনফারেন্স পরের দিন থেকে শুরু হবে।

সকালে রুমেই নাস্তা করলাম। ডিম-মাখন-রুটি-চা, ফলফলাদি। দুপুরে আবার সেই হোটেলে নিয়ে যাওয়া হলো। আবার সেই দশা। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমরা যে হোটেলে থাকি তার উপরেই ভারতীয়দের জন্য খাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের লোকও সেখানে খায়। উপরে ইউরোপীয়ান খাবার দেওয়া হয়। যার জন্য যা বলা হয় তাই পাক করে দেয়। এর মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের অনেকের সাথে আমাদের আলাপ হলো; বিশেষ করে বিশিষ্ট লেখক মনোজ বসুর সাথে। লেখক মানুষ, ব্যবহার অতি চমৎকার। কথায় কথায় 'ভাই' 'দাদা' বলে সম্বোধন করে, পরে আমার সাথে খুব ভালোবাসা হয়ে গেল। দূর দেশে বাঙালি, আবার লেখক, গুণী মানুষ, তাঁর কাছে বাংলা ভাষার মতো ভাষা দুনিয়ায় আর নাই। তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, আপনারা কোথায় ভাত খান?" তিনি বললেন, "কেন, উপরে, চিংড়ি মাছ পাকাইয়া দেয়, ডিম, মুরগির মাংস, সমুদ্রের মাছ, ডাল যা বলবেন সব দেয়।" মানিক ভাই পূর্বেই বলে দিয়াছেন, আমি আর ও হোটেলে খেতে যাব না, উপরে খাবো। আস্তে আস্তে আমরা সকলেই পীর সাহেবের কাছ থেকে কেটে পড়লাম। পরে দেখা গেল পীর সাহেব ছাড়া আমরা সকলেই উপরে খাওয়া আরম্ভ করলাম। উপরে ভারতীয় ও পাকিস্তানি পাক শুরু হয়ে গেল। ফলের অভাব নাই, যথেষ্ট জোগাড় আমাদের জন্য চীন শান্তি কমিটি করেছে।

মানিক ভাইয়ের কথা কিছু না বললে অন্যায় হবে। মানিক ভাই যে এত খেতে পারেন সে ধারণা আমার কোনো দিন ছিল না। হয়তো কোনোদিন একটা মুরগিই খেয়ে ফেলে, সাথে সাথে ডিম, মাছ ফল-ফলারি, বসে বসে শুধু খায় আর খায়। মানিক ভাই বলেন, "বেশি কথার কাম নাই। খাবার সময় গোলমাল করো না। চুপচাপ খাও, সময় পাওয়া গেছে। দেশে লীগ আমলে কী খেতে পাই মনে নাই।" রুমে ফিরে এসে আমি, আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই খুব হাসাহাসি করতাম, মানিক ভাইয়ের খাওয়া নিয়া। আমি আর আতাউর রহমান সাহেব মানিক ভাইয়ের পিছনে লেগেই থাকতাম।

শান্তি সম্মেলন শুরু হলো। প্রথমেই অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ম্যাডাম-সেন তাঁর বক্তৃতা পড়ে শোনালেন। নয়াচীনের পিতা সান ইয়াৎ-সেনের নাম আপনারা জানেন, যিনি দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেন। বিদেশিদের দেশ থেকে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু গড়ে যেতে পারেন নাই। তার পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন তাঁরই স্ত্রী।

চিয়াং কাইশেকের নাম আপনারা সকলে জানেন—যিনি সান ইয়াৎ-সেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এবং দুই নেতা দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন, চিয়াং কাইশেকের স্ত্রীর বড় বোন। দুঃখের বিষয় দেশের সাথে স্বামী-স্ত্রী বেইমানি করেছিল বলে আর দেশে যেতে পারে না। জনগণ তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই ফরমোজা দ্বীপে আমেরিকান সাহায্য নিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে, কিন্তু কেহ গ্রাহ্য করে না। কারণ, সকলেই জানে দেশের থেকে বিতাড়িত আমেরিকার দালাল।

ম্যাডাম আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি জানালেন, আমরা শান্তি চাই। বহু ঝড়ঝাপটা আমাদের দেশের ওপর দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা গেছে। সোনার দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আরও বললেন যে, আপনাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারি নাই। সেজন্য ক্ষমা করবেন। আরও অনেক কিছু বললেন।

আমি ভাবলাম, এত যত্ন তবু যদি 'কিছু' না হয় তবে আবার কী?

একটা কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছি। আমরা ৩৬৭ জন ডেলিগেট, ৩৭ জন পর্যবেক্ষক, ২৫ জন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ৩৭টা দেশের থেকে সেখানে যাই। কিন্তু এত লোকের থাকার জায়গা হঠাৎ দেওয়া কষ্টকর মনে করে চীন সরকার জনসাধারণকে অনুরোধ করলো যে, বিদেশ থেকে তোমাদের অতিথি আসবে তাদের জন্য একটা চারতলা দালান করতে হবে। সমস্ত লোক ঝাঁপাইয়া পড়লো, ৭০ দিনে বিরাট চারতলা এক দালান করে ফেললো। তা দেখে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! আমরা দেখি সরকারি কাজ কন্ট্রাক্টটার সাহেবরা আস্তে আস্তে করেন। অনেক কিছু কারুকার্য হয়। যত অল্প পয়সায় কাজ হবে ততই তাদের লাভ হবে ইত্যাদি।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, জনসাধারণ ঝাঁপাইয়া পড়লো কেন? জানলাম, জনগণ ভাবে এটা তাদের কাজ। তাই তারা যে যতদিন পারে খেটে দেয়, কারো ওপর জোর নাই। আমাদের রাষ্ট্রদূত বললেন যে ৭ দিন তার কোনো চাকর ছিল না। কারণ জাতীয় সরকার ডাক দিয়েছে, দেশের কাজে তাদের সাহায্য করা কর্তব্য। তাই তারা রাষ্ট্রদূতকে বলে চলে গেল। রাষ্ট্রদূতের বেগম সাহেবার নিজেরই পাক করে খেতে হয়েছে।

কনফারেন্সে ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেনের বক্তৃতার পরে চীন শান্তি কমিটির সভাপতি কমরেড কোঃ মোঃ জোঃ লেখা বক্তৃতা পড়লেন। আমাদের 'কানফোন' ছিল। তিনি যদিও চীনা ভাষায় বক্তৃতা করছেন আমরা কিন্তু ইংরেজিতে শুনছি। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ হলো, 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোরিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, জাপান সকল জায়গায় জাতীয় আন্দোলনকে দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা-তা অত্যাচার করছে।'

আরও বললেন, 'যুদ্ধ চাই না, তবে যদি কেহ যুদ্ধ করতে আসে তবে যুদ্ধের সাধ আমরা মিটাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখি। চীনের ৬০ কোটি জনসাধারণ আজ শান্তি চায়। আর যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের ওপর আমাদের সহানুভূতি আছে।' কোরিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধেও অনেক কিছু বললেন, জীবাণু যুদ্ধে কীভাবে সাধারণ মানুষ শৃগাল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে অসুস্থ অবস্থায় মরছে তারও করুণ কাহিনি শোনালেন।

তারপর অনেক রিপোর্ট, বক্তৃতা আর বক্তৃতা চললো। চারটা সাব কমিটি প্রস্তাব লেখার কাজে লেগে গেল। আমরা সকলেই ভাগ ভাগ হয়ে সাব কমিটিতে যোগদান করলাম।

আলাপ করে জানা গেল যে, প্রায় অর্ধেকের বেশি ডেলিগেট কম্যুনিস্ট নহে। আমাদের স্বতন্ত্র মতবাদ। সেভাবেই প্রস্তাব করা হলো। এক পয়েন্টে আমরা সকলে একমত, শান্তি চাই। ভারত থেকে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বহুদলের লোক প্রায় ৬০ জন গেছে। আমাদের দলের মধ্যে ২/৪ জন কম্যুনিস্ট থাকলেও ৩০ জনের মধ্যে প্রায় ২৫ জন আমরা কম্যুনিস্ট নই। চীন শান্তি কমিটি নিজেদের ইচ্ছামতো প্রস্তাব পাশ করাতে চেষ্টা করেন নাই, আমরা আলোচনা, ডিবেট করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

কাশ্মীর প্রস্তাব আমরা উত্থাপন করতে চাইলাম, কারণ ভারত জোর করে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ হলে বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। গণভোট হলে কাশ্মীরের জনগণ নিশ্চয় পাকিস্তানে যোগদান করবে। ভারতীয় ডেলিগেটদের মধ্যে একদল কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রথমে রাজি হলো না, তারপর অন্যান্য দেশের চাপে পড়ে রাজি হলো। ডা. সাইফুদ্দিন কিচলু যিনি ভারতবর্ষের ডেলিগেটদের নেতা, তিনিও চেষ্টা করলেন। আমরা দু'দেশের ডেলিগেটরা এক জায়গায় হয়ে আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব দিলাম। তার সারাংশ, কাশ্মীরে গণভোটের দ্বারা ঠিক হবে তারা কোন দেশে যোগদান করবে! কোনো বিদেশি সৈন্যবাহিনী সেখানে থাকতে পারবে না। চীনের শান্তি কমিটি প্রস্তাব পাশ করতে খুবই সাহায্য করেছিল। এই প্রস্তাবে দুনিয়ার কাছে প্রমাণ হয়ে গেল ভারত জোর করে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে। কারণ পাকিস্তান বারবার গণভোটের দাবি করেছে। ভারত বাহানা করে গণভোট হতে দেয় নাই। এই

প্রস্তাবও সভায় পাশ হলো। আমাদের পক্ষ থেকে পীর মানকী শরীফ, আতাউর রহমান খান ও আরও কয়েকজন দস্তখত করলেন। ওদিক থেকে ডা. কিচলু ও অনেকে দস্তখত করলেন। সভায় বেশ ভালো ভাবের সৃষ্টি হলো। কারণ এই নিয়ে খুব আলোচনা চলছিল। এও হতে পারতো, আমরা এক প্রস্তাব ও ভারত আর এক প্রস্তাব হাজির করলে সভায় খুবই হৈচৈ হতো। যা হোক, দুই দেশের ডেলিগেট একমত হয়ে প্রস্তাব করাতে সকলেই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করলো। এইভাবে প্রস্তাবগুলি এক এক করে পাশ হয়ে গেল। যদিও প্রত্যেক প্রস্তাব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কারণ নানা মতের লোক সেখানে গিয়াছে। কেউ কম্যুনিস্ট, কেউ কংগ্রেস, কেউ মুসলিম লীগ, কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ সোশ্যালিস্ট। কেউ আবার ডেমোক্রাট, কেউবা ইমপ্যারিয়ালিস্ট।

আমাদের দেশ থেকে অনেকেই বক্তৃতা করলো, অনেক দেশের লোক তাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জানালো। অনেক করুণ কাহিনিও বললো—কী করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশকে শোষণ করছে। তুরস্ক থেকে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নাজিম হিকমতও সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি প্রথমেই একটা কবিতা শোনালেন, তারপর বক্তৃতা শুরু করলেন। তুরস্কের অবস্থা আমরা যা জানতে পারি, তার চেয়ে অনেক খারাপ। শতকরা ২৫ জন লোক যক্ষ্মা রোগে ভোগে। আরও নানা বিষয়ে জানালেন।

ইরানের থেকে ৩/৪ জন যোগদান করেছিলেন। একজন বক্তৃতায় বললেন যে, সমস্ত ইরানের সম্পত্তির মালিক এক হাজার ফ্যামিলি। আর সকলে দিনমজুর। দেশের অবস্থা ভয়াবহ। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশকে শোষণ করে শেষ করে দিয়েছে।

এমনিভাবে ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি, ক্যানাডা, জাপান যার যার দেশের অবস্থা জানালেন। এও জানালেন যে, তারা শান্তি চান। বাঁচবার জন্য শান্তি চান। নর্থ কোরিয়ার ডেলিগেটরা জানালো, কীভাবে তাদের ওপর জীবাণু বোমা ছেড়েছে আমেরিকানরা। জাপান বললো, "লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান পয়দা করেছে আমেরিকানরা। তাদের হাতে আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত আমেরিকান সৈন্য আমাদের দেশে পড়ে আছে, আমাদের দেশকে রক্ষা করার নামে আমেরিকানদের যাবতীয় খরচ জাপানি জনসাধারণকে বহন করতে হয়। ঘরে বাইরে যাবতীয় কাজে আমেরিকানরা হস্তক্ষেপ করবে। যত সৈন্য জাপানে আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য গড়ে পাঁচশত টাকা মাসে আমাদের খরচ করতে হয়। আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে বাঁচতে চাই, তাই শান্তি চাই।" জাপানিদের পাসপোর্ট দেওয়া হয় নাই। তারা নৌকায় সমুদ্র পার হয়ে পালিয়ে এসেছে, তাও আবার ৫০ জনের মতো। আর ফিরে যাওয়ার উপায় নাই। গেলেই জেলে

পচতে হবে, তবুও তারা বললো আমরা যাবো। দেশেই মরবো। বীরের জাত আজ বিপদে পড়েছে। দুঃখ হয়।

ভিয়েতনাম থেকে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে একটা মেয়েও ছিল। তার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। এই মেয়েটি 'মেয়ে গেরিলা বাহিনী'র একজন ক্যাপ্টেন। একাই ৮০ জন ফ্রান্সের সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করেছিল। দেখতে মনে হলো কত নিরীহ বেচারি। মেয়েটা যখন বক্তৃতা করলো তখন বললো, দেশের স্বাধীনতার জন্য ইন্দোচীনের প্রত্যেকটা নরনারী আজ ক্ষেপে উঠেছে; যে পর্যন্ত ফ্রান্স আমাদের দেশ ছেড়ে না যাবে সে পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই।

আমেরিকা থেকে প্রায় ৩০ জন এসেছিলেন। তাদের নেতা ছিলেন একজন নিগ্রো। কেমন করে সাদা চামড়াওলারা নিগ্রোদের অত্যাচার করে তার কাহিনি প্রকাশ করলেন। তবে একজন সাদা চামড়া আমেরিকান এও বললেন, দেশের লোক আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে এটা কত বড় অন্যায়। নিগ্রো ছেলেমেয়েরা সাদা চামড়ার ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে পারে না, এক স্কুলে পড়তে পারে না, বিবাহ তো দূরের কথা! চিন্তা করুন, "'স্বাধীন দুনিয়ার নেতার' দেশের এই অবস্থা! তিনি দুনিয়ায় গণতন্ত্র কায়েম রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে কোরিয়ায় সৈন্য পাঠান, চিয়াং কাইশেককে সাহায্য দেন। ইরানে ইংরেজকে সাহায্য করেন।"

নিগ্রো নেতা বললেন যে, "আমেরিকার জনসাধারণ আজ আর যুদ্ধ চায় না, তবে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ বাঁধাতে ব্যস্ত। কিন্তু আমরা দেশের মধ্যে শান্তির পক্ষে এমন আন্দোলন করবো যাতে সরকার বাধ্য হয় শান্তি চাইতে। এ কথাও বললেন, যদি সরকার জানতে পায় যে, আমরা এরা শান্তি চাই তবে ছলে-বলে-কৌশলে খতম করে দেবে বিচারের নামে প্রহসন করে।"

ভারতীয় দল থেকে ডা. কিচলু, কম্যুনিস্ট নেতা মি. গোপালন বক্তৃতা করলেন। প্রত্যেকেই তাঁদের নেতা মি. জওহরলাল নেহরুর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, ভারতের জনসাধারণ শান্তি চায়। বর্তমান কংগ্রেস সরকারও শান্তি চায়। পণ্ডিত নেহরু দুনিয়ার শান্তির জন্য সংগ্রাম করবেন। কোনো ব্লকেই তিনি তাঁর দেশকে যোগদান করতে দেবেন না।

কম্যুনিস্ট নেতা মি. গোপালন বললেন, আমেরিকা বা কোনো সাম্রাজ্যবাদী সরকার যদি চীন দেশের ওপর আক্রমণ করে, তবে ৩০ কোটি ভারতবাসী চীনকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। আরও অনেক কিছু বললেন, যা এখন আমার মনে নাই। কংগ্রেসীদের মধ্যে থেকেও অনেকেই বক্তৃতা করলেন। মনে হলো, একই সুরে গাঁথা। অনেকে আবার মহাত্মা গান্ধীরও প্রশংসা করলেন। মহাত্মা গান্ধীর এক শিষ্য গিয়েছিল ঐ নেংটি পরে। তিনিও বক্তৃতা করলেন, খবর নিয়ে জানলাম তিনি দাক্ষিণাত্যের এক বিখ্যাত নেতা।

সকল দেশের নেতারা বক্তৃতা করলেন। কয়েকদিন শুধু বক্তৃতাই হলো। মাঝে মাঝে রাতে থিয়েটার, নাচ হতো আমরা দেখতে যেতাম। ভারতীয়রা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তারা গায়ক, নৃত্যশিল্পী নিয়ে গিয়েছিল। মানিক ভাইয়ের এক বন্ধু পিরোজপুর বাড়ি, তখন কলকাতায় থাকেন, তিনি খুব ভালো গায়ক– মাঝে মাঝে গান গেয়ে মুগ্ধ করে দিতেন। একজন মহিলা গিয়েছিলেন; তিনি নেচে নাম করেন। সত্যই তিনি খুব ভালো নাচতে পারেন। ভারতীয়রা অনেক জিনিসপত্র উপহার দেবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তারমধ্যে আমাদের আব্বাসউদ্দীন সাহেবের কয়েকখানা রেকর্ডও ছিল। সে-সব চীন শান্তি কমিটিকে উপহার দিয়েছিলেন।

আমরা পাকিস্তানিরা কিছুই নেই নাই। কী করবো? পীর সাহেবকে বললাম। তাঁর সাথে পরামর্শ করে কয়েকখানা পাকিস্তানের পতাকা বানিয়ে তাই উপহার দিলাম। পাকিস্তান থেকে পীর মানকী শরীফ, আতাউর রহমান সাহেব, সরদার শওকত হায়াৎ, খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর ও আমি বক্তৃতা করলাম। মহিলাদের পক্ষ থেকে বেগম মাজাহার এবং শওকত হায়াত খানের বোনও বক্তৃতা করলেন। চমৎকার বক্তৃতা করেন ভদ্র মহিলা। সকলেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলেন। আমি বক্তৃতা করলাম বাংলা ভাষায়, আর ভারত থেকে বক্তৃতা করলেন মনোজ বসু বাংলা ভাষায়।

বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে। মানিক ভাই, আতাউর রহমান খান ও ইলিয়াস বক্তৃতাটা ঠিক করে দিয়েছিল। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি।

পাকিস্তানের কেহই আমরা নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার বক্তৃতায় বলি নাই। কারণ মুসলিম লীগ সরকারের আমলে দেশের যে দুরবস্থা হয়েছে তা প্রকাশ করলে দুনিয়ার লোকের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাব। অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, ভারত থেকে একজন বাংলায় বক্তৃতা করলেন, আর পাকিস্তান থেকেও একজন বক্তৃতা করলেন, ব্যাপার কী? আমি বললাম, বাংলাদেশ ভাগ হয়ে একভাগ ভারত আর একভাগ পাকিস্তানে পড়েছে। বাংলা ভাষা যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা এ অনেকেই জানে। ঠাকুর দুনিয়ায় 'ট্যাগোর' নামে পরিচিত। যথেষ্ট সম্মান দুনিয়ার লোক তাঁকে করে। আমি বললাম, পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ জন লোক এই ভাষায় কথা বলে। এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম ভাষা বাংলা। আমি দেখেছি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন খুব ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করলেন চীনা ভাষায়। একটা ইংরেজি অক্ষরও তিনি ব্যবহার করেন নাই।

চীনে অনেক লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছে, অনেকেই ইংরেজি জানেন, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলবেন না। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। আমরা

নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজি জানেন, কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন চীনা ভাষায়। দোভাষী আমাদের বুঝাইয়া দিলো। দেখলাম তিনি মাঝে মাঝে এবং আস্তে আস্তে তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন যেখানে ইংরেজি ভুল হচ্ছে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। একেই বলে দেশের ও মাতৃভাষার উপরে দরদ।

আমাদের সভা চললো, বক্তৃতা আর শেষ হয় না। এত বক্তৃতা দেওয়ার একটা কারণ ছিল। প্রত্যেক দিন সভায় যে আলোচনা হয় এবং যারা বক্তৃতা করেন তাদের ফটো দিয়ে বুলেটিন বাহির হয়। এই লোভটা অনেকেই সংবরণ করতে পারেন নাই। "আর আমার বক্তৃতা দেওয়া ছিল এই জন্য যে, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিবো।"

যে হলে আমাদের সভা হয় তাহা বড় চমৎকার। কলকাতা কাউন্সিল হাউসের মতো, বুঝি একটু বড়ই হবে। একদিকে সভাপতিমণ্ডলীরা বসেছেন, আর সামনে ডেলিগেটরা বসেছেন। সভাপতিমণ্ডলীদের ঠিক পিছনে ৩৭টা দেশের পতাকা একইভাবে উড়ছে। হলের গেটেও ৩৭টা পতাকা লাগাইয়া দেওয়া হয়েছে। আমাদের পাকিস্তানের পতাকাটা খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সিল্কের কাপড় দিয়ে করা ভারতের ও আমাদের পতাকা পাশাপাশি। হলের ভিতর ফ্ল্যাশ লাইট মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে—যখন ফটো নেওয়া হয়। ১০/১৫ জন ফটোগ্রাফার অনবরত ফটো নিচ্ছে। পাশ দেখাইয়া হলে ঢুকতে হয়। পাশের রুমে চা খাবার বন্দোবস্ত আছে। দরকার হলেই যেয়ে খেতে পারেন। পিছনে ফুলের বাগান ও মাঠ রয়েছে, রয়েছে বসার জায়গা। যখন বিশ্রামের জন্য সভাপতি সময় দেন, তখন একে অন্যের পাশে বসে আলাপ করে ঐ ফুলের বাগানে যেয়ে।

সম্মেলন ১১ দিন চলে। সকাল বিকাল এইভাবে চলতে থাকে। অনেক দেশের প্রতিনিধির সাথে আলাপ হয়। অস্ট্রেলিয়ার এক প্রতিনিধি আমার সাথে আলাপ করতে করতে বললেন, "তোমার দেশের রাষ্ট্রদূতরা মনে করে দুনিয়ার মানুষ আহাম্মক!" আমি বললাম, "কেন এ কথা বলছেন?" তিনি উত্তর করলেন যে, "রাষ্ট্রদূত ও কর্মচারীরা যেভাবে থাকেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও সেভাবে থাকতে পারে না। অন্যান্য যে সকল দেশের জনগণের অবস্থা খুব ভালো, খায়ও অনেক এবং পরিমাণে বেশি—আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতরা যে অবস্থায় থাকে, তার চেয়েও অনেক ভালো অবস্থায় থাকে এবং যা-তা ভাবে অর্থ ব্যয় করে। আমাদের বোঝাতে চায় যে, তোমরা কত ভালো আছ। আমরা রাজনীতি করি, দেশ-বিদেশের খবর রাখি। তোমাদের দেশের মাথা প্রতি আয় কত? দেশের লোক না খেয়ে মরে, কাপড় পর্যন্ত জোগাড় করতে পারে না। এ সব খবর আজ দুনিয়ার শিক্ষিত সমাজ ভালো করেই জানে। দেশের মানুষ না খেয়ে মরে আর সেই দেশের কর্মচারী অথবা

রাষ্ট্রনায়করা যেভাবে বাজে খরচ করে তা ভাবলে আমাদেরও লজ্জা করে।” আপনারা বুঝতেই পারেন কী উত্তর আমি দিবো! হ্যাঁ না করে কেটে পড়লাম। লজ্জা হয়। যারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়, আমেরিকা অথবা গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতদের সাথে পাল্লা দিয়া খরচ করে–আর তাদের কাছে আবার ভিক্ষা চায়, “আমাদের সাহায্য দেও আমাদের মিলিটারি সাহায্য দেও”–যা বলবা তাই শুনবো। তোমাদের অস্ত্র তোমাদের মত ছাড়া ব্যবহার করবো না। কাঁচামাল আছে তোমাদের দেব। তারপর যাহা থাকবে অন্যকে দেব। সেসব দেশের মানুষ আমাদের নেতাদের বাহাদুরি দেখলে হাসবে না কেন?

দক্ষিণ আমেরিকার একটা দেশের ডেলিগেটের সাথে আলাপ হলো। তিনি বললেন, পাকিস্তান কি একটা স্বাধীন দেশ না ভারতের একটা প্রদেশ? আমি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, বোধ হয় লোকটা দলে পড়ে এসেছে। রাজনীতি বা দুনিয়ার খবর খুব রাখে না। তবে এ কথাও মনে হলো, পাকিস্তান সম্বন্ধে দুনিয়ায় কোনো বিশেষ প্রোপাগান্ডা হয় নাই। এটার প্রমাণ আমি ঢাকায় পেয়েছি। এক বন্ধুর বাড়িতে যাই। তার শালা আমাকে একটা চিঠি দেখালো, আমেরিকার একজন স্কুল মাস্টার লিখেছেন, উপরে ঠিকানা লেখা : ‘পাকিস্তান-ইন্ডিয়া।’ এতেই বোঝা যায়, আমাদের দূতেরা কি প্রোপাগান্ডাই না করেছে বিদেশে পাকিস্তান সম্বন্ধে! দুনিয়ার মানুষ জানে আমাদের লোকসংখ্যা কত? আর বাজেট কত? মাথাপিছু গড় আয় কত? আমাদের দেশের গ্রামে একটা কথা আছে, ‘মিঞার বাড়ি খাবার নাই, বাহির বাড়ি বড় কাচারি’, দশা হয়েছে তাই।

তবে এই কনফারেন্সে যোগদান করে ৩৭টা দেশের প্রতিনিধিরা পাকিস্তান সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে গিয়েছে। কাশ্মীর যে ভারতবর্ষ জোর করে দখল করে রেখেছে এ খবরটাও ভালোভাবে জানতে পেরেছে। কারণ আমাদের দেশের প্রতিনিধিরা কোনো দেশের প্রতিনিধিদের চেয়ে বুদ্ধি, কথা ও বক্তৃতায় কম ছিল না। আনন্দের ভিতরই আমাদের কনফারেন্স শেষ হয়ে গেল।

কনফারেন্স যখন চলছিল মাঝে মাঝে আমরা বিখ্যাত জায়গা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, মসজিদ, শ্রমিকদের অবস্থা, কৃষিব্যবস্থা দেখতে যেতাম। আমি তো প্রায়ই রিকসা একখানা নিয়া বেরিয়ে পড়তাম। পিকিং শহরে আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো। আমরা এক ক্লাসে ল’ পড়তাম। আমার সাথে পড়ার সময়ই খুব খাতির ছিল। বেচারি কাগজে আমার নাম দেখে আমাকে খুঁজতে এলো। কিন্তু আমাদের পায় নাই। সে যখন আসতো আমি তখন বাহিরে থাকতাম।

‘লিবারেশন ডে’–নয়াচীনের স্বাধীনতা দিবসে আমরা জনগণের মিছিল এবং সামরিক কুচকাওয়াজ দেখতে গিয়েছি। উপরে দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ দেখি আমার মতো কালো আচকান, সাদা পায়জামা পরে সাথে একজন শাড়ি পরা মহিলাসহ এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। চেয়ে রইলাম, কে যায়? হঠাৎ দেখি মাহবুব ও তার স্ত্রী। মাহবুব পাকিস্তান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি। ও যে এ চাকরি

কবে পেয়েছে, এ খবর আমার জানা ছিল না। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে, নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম।

তিন চার ডাক দেওয়ার পর ওর স্ত্রী ওকে ধাক্কা মেরে আমাকে দেখিয়ে দিলো। ও আমাকে বললো, "বেলা ৪টায় তোর হোটেলে যাবো।" বিদেশে একটা বন্ধুকে পেয়ে বড় আনন্দ হলো। ঠিক চারটায় মাহবুব ও তার বিবি উপস্থিত হলো। আমাদের ওর বাসায় খেতে দাওয়াত করলো। আমি ওর স্ত্রীকে বললাম, আপনি যদি ঝাল দিয়া মাছ পাক করে খাওয়ান তবে এক্ষুনি আপনার বাসায় যাবো। উনি বললেন, আজ তো আর বাজারে মাছ পাওয়া যাবে না। আজ এমনি বেড়াইয়া আসুন, কাল খাওয়াব। আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন। আমরা ওর বাসায় গেলাম। নাস্তা খেলাম, দেশের কথা বললাম। ওর স্ত্রী আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন। মনে হলো তিনি আমাদের পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়েছেন। এর কারণ প্রায় দুই বৎসর ওরা দেশে যায় নাই। ওর স্ত্রী দেশের কথা জানতে পাগল হয়ে উঠল। এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন, ঢাকার অবস্থা কী? পরিবর্তন কিছু হয়েছে কি না? রাজনীতির সাথে তাদের সম্বন্ধ নাই। ঐ প্রশ্নই আমাদের করলো না। আমরা তাদের সাথে রাজনীতি আলোচনা করলাম না। সময় পেলেই আমরা ওদের ওখানে যেতাম।

পাকিস্তান ডেলিগেটদের একদিন আমাদের রাষ্ট্রদূত রাত্রে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। আমরা সকলেই সেখানে গেলাম। পিকিংএও আমাদের নিজেদের জায়গা আছে। রাষ্ট্রদূত সকল কর্মচারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিজেই আমাদের যত্ন করতে আরম্ভ করলেন : "আপনি এটা খান, ওটা খান—সবই পাকিস্তানি খাবার তৈরি করেছি।" খবর নিয়ে জানলাম, রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী নিজেই আমাদের জন্য পাক করেছেন। সকাল থেকে আর পাকের ঘর ছেড়ে বাইরে আসেন নাই। বোধ হয় দেশি মানুষ বহুদিন পান নাই, তাই আমাদের পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছেন। আমাদের রাষ্ট্রদূতের নাম মেজর রেজা। পূর্বে মিলিটারিতে ছিলেন। লোকটাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো, কত অমায়িক ব্যবহার। বেশি আড়ম্বরের সাথে থাকে না, আর টাকাও বেশি খরচ করেন না বলে মনে হলো। লোকটার দেশের জন্য অত্যধিক দরদ—কথায় বুঝলাম। রাষ্ট্রদূত এই রকম লোক হলেই দেশের ইজ্জত বিদেশে বাড়ে। তাঁর সাথে আমাদের আলাপ হলো অনেকক্ষণ ধরে। নিজের বাড়িতে এসেছি মনে হলো, তাই উঠতে ইচ্ছা হয় না। রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত আমরা সেখানে রইলাম। পরে সবাইকেই গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিলেন—আমরা যে হোটেলে থাকি সেই হোটেলে।

আমি ২/৩ দিন পরে আবার রিকসা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের অফিসে যাই। অফিসের সাথেই আবার মাহবুবের বাড়ি। অফিসে একজন ডিউটি অফিসার ছিলেন। ভদ্রলোক পাঞ্জাবি, খুবই অমায়িক ব্যবহার। অনেকক্ষণ পরে যখন মাহবুবের বাসায় এলাম, দেখলাম মাহবুব ও তার বিবি বেরিয়ে যাচ্ছেন।

তাদের সাথে আর একজন সেক্রেটারি আছেন। বেচারা মোটর থেকে নেমে আমাকে বললো, বেরিয়ে যাচ্ছি, বড়ই দুঃখিত, কাল এসো অথবা রাতে এসো। আমি গড়ি পাঠিয়ে দেব। আমি বললাম, মোটরের প্রয়োজন নাই। আমি একাই রিকসায় বেড়াই। দেখতে চাই কী অবস্থায় এদেশের লোক আছে। আর কীভাবে এরা বাস করে! কাল যদি সময় পাই তবে নিশ্চয়ই আসবো। এই বলে আমি বিদায় নিলাম।

হোটেল থেকে যখন আসি তখন আমার দোভাষী আমাকে বলেছিল, রিকশা ভাড়া আমার দেশের টাকায় আট আনা হয়, ওদের প্রায় দুই হাজার 'ইয়ান' (চীনা টাকার নাম) আমি তাই ওকে দিয়া দিলাম। বেচারা খুশি হয়ে নিয়ে গেল। এখন যাবার সময় তো আর দোভাষী নাই। কে আবার দাম ঠিক করে দেবে, আবার কোথায় যাব বললে ওরা বুঝবে কি না? মহা বিপদ! ভাবলাম এক মাইল পথের বেশি তো হবে না, আস্তে আস্তে হেঁটে যাব। যদি ঠিক করে বলতে না পারি যদি রিকশাআলারা আমার কথা না বোঝে? রাস্তায় এলাম। কিছু দূর হেঁটে দেখি একটা রিকশা দাঁড়াইয়া আছে। তাকে বললাম, পিকিং হোটেল। পিকিং হোটেল ও বুঝলো, বললো : আসো, কথা না–মাথা নেড়ে। উঠে বসে পড়লাম। ভাবলাম, চিন্তা কী! কোথায় নিয়ে যায় দেখা যাক। দেখি ঠিক হোটেলেই নিয়ে এসেছে। আমার মনে একটা কথা উঠলো, দেখি বিদেশি লোক পেলে, কেমন লুট করে। আমি হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে প্রায় ১০ টাকা পরিমাণ হাতে করে ওর সামনে ধরলাম। ভাবে সাবে বুঝাইয়া দিলাম, যাহা তোমরা নিয়ে থাক তাই নেও। রিকশাআলা আমার হাত থেকে ঠিক আট আনা পয়সা গুনে নিয়ে চলে গেল।

এদের চরিত্রের এই পরিবর্তনের কারণ কী? দোভাষীকে ডেকে পাঠালাম হোটেলে যেয়ে। আসলে তাকে বললাম, তোমাদের দেশের রিকশাআলা তো, "চোর।" আমি একটু চালাকি করলাম, দেখি ওর মুখচোখ লাল হয়ে গেছে। লজ্জায় ও রাগে। আমায় জিজ্ঞাসা করলো, "ব্যাপার কী?" আমি বললাম, "বসুন বলছি।" বেচারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো, শুধু বারবার জিজ্ঞাসা করে–পরে আমি তাকে সত্য ঘটনাটা খুলে বললাম। তোমরা কী করে এদের চরিত্রের পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি করতে পারলে? তখন সে হেসে উঠে বলতে লাগলো, দেখো এদের 'ট্রেড ইউনিয়ন' আছে। এরা যা উপার্জন করে যতটুকু এদের দরকার তা রেখে যতটুকু সম্ভব ইউনিয়নে জমা দেয়। সেই টাকা দিয়ে ওদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, ওদের জন্য থাকার বাড়ি, রিকশা মেরামত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত ও অন্যান্য কাজ করে দেওয়া হয়। আমি বললাম, "কড়া শাসনও বোধ হয় করা হয়?" দোভাষীটা ছেলে মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ে। হঠাৎ হেসে দিয়ে বললো, আপনারা বোধ হয় শুনেছেন আমাদের সরকার খুব অত্যাচার করে এবং বেশি শাস্তি হয়। সে বললো, "কথাটা কিছু সত্য। যখন ওদের কেউ ঠকাতে পারবে না, খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে

দেওয়া হচ্ছে, ভালো ভালো থাকার বাড়ি করে দেওয়া হচ্ছে, তখন যদি ওরা কাউকে ধোঁকা দিয়ে অথবা ফাঁকি দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করে তবে কেন ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে না?"

দোভাষী আমাকে বললো, দেখুন, নয়া সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত মহাজনের কাছ থেকে ওরা রিকশা ভাড়া নিত–দিনভর যা উপার্জন করতো তা সকলই প্রায় মহাজনদের দিয়ে দিতে হতো। ওরা দিন রাত পরিশ্রম করেও ভাত জোগাড় করতে পারতো না। যাকে ইচ্ছা রিকশা ভাড়া দিত। কিছু বললে বা প্রতিবাদ করলে আর তাকে রিকশা চালাতে দেওয়া হত না। এখন আর মহাজনরা তা পারে না। তারা তাদের ন্যায্য ভাড়া পায়, আবার ওদেরও যা থাকে তাতে সংসার চলে যায়। মহাজনরা ইচ্ছামতো তাড়াতে পারে না। যদি কেহ খারাপ কাজ করে, ট্রেড ইউনিয়নে জানাতে হবে। তারা খোঁজখবর নিয়ে বিচার করবে। আপনারা মনে করবেন না, কম্যুনিস্ট দেশ–তাই মহাজনদের রিকশা সব কেড়ে নিয়ে রিকশা চালকদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাজনরা রীতিমতো ভাড়া পাচ্ছে। রিকশার মালিক-মহাজনদের অত্যাচার আর খামখেয়ালি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; এদিকে রিকশা চালকদের ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়েছে। আমাকে বললো, রিকশা চালকদের নূতন বাড়ি দেখতে যাবেন? আমি বললাম, "নিশ্চয় যাব।"

একদিন বিকালে আমাকে নিয়ে গেল দেখাবার জন্য। দেখলাম ছোট দুই কামরা করে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল করে দেওয়া হয়েছে, বেশ ভালোই আছে। আমাকে বললো, দেখুন আমাদের নূতন স্বাধীনতা, আমরা আস্তে আস্তে সকলই করবো। দেখলাম, সরকারকে কত ভালোবাসে এই লোকটা।

মাঝে মাঝে আমি ও ইলিয়াস বেরিয়ে পড়তাম। স্কুল দেখতে যেতাম, মসজিদ দেখতে যেতাম। এক মুসলমান পাড়ায় যাই। তখন নামাজের সময় একটা মসজিদে কয়েকজন মুসলমান নামাজ পড়ছে। নামাজ শেষ হওয়ার পরে আমার দোভাষী ওদের কাছে যেয়ে বললো, দেখ ইনি মুসলমান, শান্তি সম্মেলনে এসেছেন পাকিস্তান থেকে। ২/৩ জন আমার কাছে এলো, এসে আমাকে 'আস্সালামু আলাইকুম' দিয়া দাঁড়াল। কী যেন জিজ্ঞাসা করলো, আমি বুঝলাম না। দোভাষীর দিকে তাকালাম। দোভাষী আমাকে বললো, "কেমন আছেন? আপনাদের দেশ কেমন?" আমি বললাম, 'খুব ভালো।' তারা বললো, "আপনাদের দেশের লোক নামাজ পড়ে?" আমি বললাম, "খুব পড়ে। সকলেই প্রায় নামাজ পড়ে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা সকলেই নামাজ পড়েন?" ওরা বললেন, "কেহ কেহ পড়ে, সকলে তো পড়ে না।" "আপনাদের কম্যুনিস্ট সরকার নামাজ পড়তে দেয়?" ওরা খেপে বললো, "সব মিথ্যা কথা আপনারা শুনেছেন, আমরা নামাজ পড়ি, কোরআন পড়ি। ছেলেমেয়েদের কোরআন শিখাই। কেউ আমাদের বাধা দেয় না। আমরা খুব ভালো আছি।"

দোভাষী আমাকে বুঝাইয়া দিলো। ভাবলাম, বোধ হয় ভয়েতে বললো। আরও খোঁজ নিতে হবে। তারপর প্রায় একা বেরুতাম। কী করবো? কথা বোঝে না, ভাবেসাবে যতদূর বোঝা যায় ও জানা যায়।

আমরা প্রায়ই বাজারে মালপত্র কিনতে যাইতাম। জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক। খুব বেশিও না, খুব কমও না। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই জিনিসের দাম। একজোড়া জুতা কিনলাম, আমাদের দেশের দামের চেয়ে কিছু কম হবে, কিন্তু খুব টেকসই। কোনো দোকানেই আপনার দাম করতে হবে না। যাবেন, দাম লেখা রয়েছে, যেটা পছন্দ হবে দামটা দিয়ে নিয়ে আসবেন। সকলের চেয়ে চমৎকার জিনিস হলো সরকারি স্টোর নামের দোকানগুলি। প্রত্যেক বড় বড় শহরে চারটা-পাঁচটা এবং বেশি ছোট শহরে একটা অথবা দুইটা, প্রত্যেক মহকুমায় একটা, এমনি করে সরকারের দোকান আছে। যাবতীয় মালপত্র সেখানে পাওয়া যায়।

এমন কোনো জিনিস নাই যা পাওয়া যায় না। যদি হঠাৎ ফুরাইয়া যায়, বলে দিবে চার পাঁচ দিন পরে আসবেন–পাবেন। এবং সমস্ত জিনিসের দাম লেখা রয়েছে। আমি কিছু কিছু জিনিস কিনে এনেছিলাম। একটা সুতার কাজ করা চাদর কিনেছিলাম ১৫ টাকায়, অন্ততপক্ষে আমার দেশে তার দাম হবে ২৫ টাকা।

২/১টা জিনিসের দাম সস্তা। আর সকল কিছুর দামই স্বাভাবিক। চীনের থেকে হংকং এ মালপত্র অনেক সস্তা। একটা আশ্চর্য জিনিস আপনাদের বলতে চেষ্টা করবো। যতগুলি শহরে আমি গিয়াছি তার সকল জায়গায় বাজারে ঘুরেছি। জিনিসপত্রের দাম দেখবার জন্য, আর পছন্দ হলে ২/১টা মাল কিনতাম। পিকিং, তিয়ানজিং, নানকিং, ক্যান্টন, হ্যাংচো শহরে ঘুরেছি, কিন্তু কোথাও একটা বিদেশি জিনিস দেখি নাই। কাপড়, জুতা, সাইকেল, ঘড়ি, কলম, স্নো, পাউডার, পুতুল যাহা কিছু মানুষের প্রয়োজন কিছুই বিদেশ থেকে আনা হয় না, এবং দেখলামও না। সিগারেটও নিজেরা করে, ফ্যাক্টরি আছে। আমার একটা অভ্যাস আছে। নিজের দাড়ি নিজেই শেভ করি, কোনোদিন সেলুন বা কোথায়ও শেভ করি না। আমার যে ব্লেড ছিল তাহা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আমি বাজারে গেলাম ব্লেড কিনতে। সমস্ত দোকান খুঁজলাম ব্লেড পেলাম না। এক দোকানে তিন চার বৎসরের একটা পুরানো ব্লেড বের করলো তার উপরে জং পড়ে গেছে। দাড়ি তো দূরের কথা 'চাড়ি'ও (নখ) কাটবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই সমস্ত পিকিং শহরে একটা ব্লেড পেলাম না, কারণ কী? দোকানদার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি জানে। আমাকে বললো, বিদেশ থেকে এই সমস্ত জিনিস আমরা আনি না। আমাদের নিজেদের ঘরে যে ক্ষুর তৈরি হয় তা দিয়েই শেভ করি। যে পর্যন্ত আমরা ব্লেড ফ্যাক্টরি করে নিজেরা তৈয়ার করতে না পারবো, সে পর্যন্ত ব্লেড কেউই ব্যবহার করবে না। আমরা বিদেশকে কেন টাকা দিবো? দেশে বসে শুনতাম, চীনদেশ রাশিয়ার হুকুমে চলে। তবে রাশিয়ার

কোনো 'ব্যবহারী দ্রব্য' ইংরেজিতে 'কনজ্যুমার গুডস' এ দেশে পাওয়া যায় না। কোনো জাপানি পুতুল নাই। আমেরিকার স্নো, পাউডার, ব্লেড, দাঁতের মাজন কিছু নাই। ভারতের কাপড়, ইংরেজের ব্লেড, কলম, সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, কিছুই এদেশে নাই। ভাবলাম বেরসিক দেশ। আমার দেশে সব পাওয়া যায়। আমেরিকা, ইংরেজ, জাপানি সব পাওয়া যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম রাশিয়া এ সমস্ত জিনিস আপনাদের দেয় না? দোকানদার পিকিং শহরের লোক। বহু ঘাত-প্রতিঘাত ওর ওপর দিয়ে গেছে বলে মনে হলো। বললো, দেখুন চিয়াং কাইশেকের আমলে আমেরিকানরা এসব বহু দিত। সেগুলি কেবল শেষ হয়ে গেছে। রাশিয়ায় শুনেছি এগুলি বেশি হয় না, তাই আমরা শিল্প গড়তে যে কলকবজা দরকার তাই আনি। রাশিয়া কাউকেও এই সমস্ত জিনিস দেয় না। আর দিলেও আমরা আনি না। আমাদের দেশ আমরা গড়বো, যারা শিল্প গড়তে সাহায্য করবে তারাই আমাদের বন্ধু। মনে মনে বললাম, 'বাবা সবাই রাজনীতিবিদ!' দরকার নাই বেশি কথা বলে। আবার কম্যুনিস্ট দেশ কী বলতে কী বলি, জান নিয়া টানাটানি। হেঁটে হেঁটে হোটেলে এলাম। কারণ বাজার খুব দূরে না, কাছেই হবে। আবার রিকশা নেব কিন্তু কথা বোঝে না, কী মুশকিল?

একদিন রাতে আমাদের চীন সরকারের পক্ষ থেকে দাওয়াত দিলো। যেতে হবে। স্বয়ং মাও সে তুং উপস্থিত থাকবেন। সাথে নিশ্চয়ই চৌ এন লাই, চ্যুতে, জিং এবং অন্যান্য বড় নেতা থাকবেন, যাঁদের জীবনী এক একটা ইতিহাস। এঁরা দীর্ঘ ৩০ বৎসর সংগ্রাম করেছেন। কেউবা ফাঁসির হুকুমে পালাইয়া আত্মরক্ষা করেছেন। কারও মাথার মূল্য কোটি কোটি টাকা ঘোষণা করেছে চিয়াং কাইশেক। সত্যই তাঁদের দেখার জন্য মনটা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আজ রাত্রে ওদের একবার চোখের দেখা দেখব। বিশেষ করে মাও সে তুংকে, যাঁর নেতৃত্বে ৫০ কোটি লোক স্বাধীন হয়েছে; যাঁর নেতৃত্বে চীনের জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে, যাঁকে দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক জমা হয়, যাঁর কথা শোনার জন্য দুনিয়া চেয়ে থাকে, তাঁকে দেখব। কী আনন্দ!

ঠিক আটটার সময় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের নেতা পীর সাহেবও আমাদের সাথে আছেন। ৩৭ দেশের প্রতিনিধি দলের নেতারা সামনের দিকে থাকলেন। আর আমরা লাইন ধরে টেবিলের ২ পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের দাঁড়িয়েই খেতে হবে। আমাদের সামনে টেবিলে খাবার প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যাওয়ার ১৫ মিনিট পরেই মাও এলেন, ব্যান্ড বেজে উঠলো। চারদিক থেকে 'মাও জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠলো। মাও হাসতে হাসতে ঢুকলেন। প্রায় ১ হাজার লোক আমরা সেখানে। সকলেই তাঁকে দেখতে যেন পাগল হয়ে উঠলো। প্রথমেই আমাদের প্রত্যেক দেশের নেতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তারা হাতে হাত মিলাইয়া এক এক করে যার যার জায়গায় চলে গেলেন। মাও সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

আমরা যে টেবিলে ছিলাম সেটা ভারত ও পাকিস্তানিদের জন্য। আর আমাদের টেবিলে সিং কিয়াং প্রদেশের গভর্নর বোরহান শহীদ আছেন। প্রত্যেক টেবিলেই এক একজন করে বড় নেতা ছিলেন, তাঁরা আমাদের সাথে খাবেন। আমি ঠিক বোরহান শহীদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে পাকিস্তানি জেনে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে সংবর্ধনা করলেন। আমি যথারীতি ইসলামি কায়দায় উত্তর দিলাম।' আমাদের খাওয়া এবং কথা শুরু হলো। ভদ্রলোক চীনা প্যান্ট ও চীনা কোট ও গোলটুপি মাথায় দিয়েছেন। আমাদের পিছনেই দেখলাম প্রায় ২৫/৩০ জন মুসলমান লম্বা জামা, গোলটুপি পরে দাঁড়াইয়া আছে। কাহারো কাহারো দাড়িও আছে, কিন্তু খুব অল্প।

আমি মি. বোরহান শহীদকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এঁরা বড় বড় মসজিদের ইমাম। এঁরা বড় বড় সভায় এবং খাওয়ার সময় দাওয়াত পেয়ে থাকেন। খাওয়া চললো। আমাদের টেবিলে মুরগি, আন্ডা, মাছ ফল-ফলাদি রাখা হয়েছিল। আমরা বেশ খেলাম।

বোরহান শহীদকে তাঁর পরিচয় চাইলাম। তিনি অতি নম্রভাবে বললেন, আমি সিং চিয়াং প্রদেশের গভর্নর। আপনাদের সভায় যোগদান করার জন্য এসেছি। আরও কয়েকজন মুসলমানও এসেছেন, পরে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তবে তারা ইংরেজি জানে না, আমিও বেশি জানি না। তবে বুঝতে পারি, ভালো বলতে পারি না। আমি বললাম যা পারেন তাতেই আমার চলবে। তাঁকে অনেক প্রশ্ন করলাম, পরে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা যখন লেখব তখন সে-সব আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। খাওয়ার পরে আমি আস্তে আস্তে ইমামদের কাছে যেয়ে 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বললাম। তাঁরা সকলেই একসাথে আমাকে 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম' বললেন। হাবে ভাবে আলাপ হলো। তাঁরা চোখের মুখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? আমিও হাত মুখ চোখ নেড়ে বোঝালাম, খুব ভালো। আপনারা কেমন? তারাও হাব ভাবে বোঝালো, খুব ভালো। আমি সকলের সাথে হাত মোছাবা করলাম, ঠিক মুসলমানি কায়দায় বুকে হাত দিলো। আবার নিজ জায়গায় ফিরে এলাম।

এর মধ্যে দেখি হৈচৈ পড়ে গেছে। একদিকে চৌ এন লাই সকলের সাথে আলাপ করার জন্য বের হয়েছেন। আর এক দিকে চ্যু তে বের হয়েছেন। চ্যু তে আস্তে আস্তে আমাদের কাছে এলেন। আমি হঠাৎ ঢুকে পড়ে তাঁর হাতের গ্লাসের সাথে আমার কমলালেবুর রসের গ্লাসের একটা ধাক্কা লাগিয়ে কমলালেবুর রসের লেমনেড খেয়ে নিলাম। এর অর্থ চীন দেশের সাথে আমার দেশের বন্ধুত্ব কামনা করলাম। আমি ফিরে আসছি। দেখি ইলিয়াস একজনের বগলের নিচ দিয়ে চ্যু তের কাছে যাবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি ইলিয়াস একেবারে তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াইয়া গ্লাসে গ্লাসে ধাক্কা মেরে ঢকঢক

করে যাহা গ্লাসে ছিল খেয়ে নিল। ও দারুণ পাজি, সকল জায়গায় থাকে কী করে? এত ভিড় ঠেলে কী করে কাছে গেল ভাববার কথা! আমি তো পারতাম না, আর যাইতামও না। চ্যু তে বেচারাকে যেভাবে সকলে ঘিরে ফেলেছে মনে হলো মেরে ফেলবে। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি। সকলের সাথেই মিশছে। মিলিটারি হাত কি না! শক্ত হাড়। কিছুক্ষণ পরে সব শেষ হয়ে গেল, আমরা চলে এলাম। আগেই মাও চলে গিয়েছেন। তাঁর মুখেও হাসি দেখলাম। মনে হলো প্রাণখোলা হাসি। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

এই মাও সে তুং! ৬০ কোটি লোকের নেতা। দেশের লোক এত ভালোবাসে এঁকে! হবেই তো, ত্যাগী, দেশকে ও জনগণকে তিনি ভালোবাসেন বলে জনগণও তাঁকে ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে।

১লা অক্টোবর নয়াচীনের 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হবে। আমাদের সকলকে দাওয়াত করা হয়েছে। চীনে এই দিনটাকে 'লিবারেশন ডে' বলা হয়। ৬০ কোটি মানুষ এই দিনে অত্যাচার অবিচার জুলুম শোষণের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল, তাই এটা ওদের অতি পবিত্র দিন। এই দিন সমস্ত চীনের লোক কাজকর্ম ছেড়ে আনন্দ করে। দিন দিন যেন আনন্দ বেড়ে চলেছে এদের। এইদিনে প্রত্যেকে তাদের কাজের হিসাব নেয় ও দেয়। দেশের জন্য কী করেছে এক বৎসরে কী কী ভালো কাজ করেছে। দেশ কতদূর অগ্রসর হয়েছে? রাস্তা কত বেড়েছে, শিল্প কতগুলি বেড়েছে। কৃষক জমি পেয়ে কত বেশি ফসল উৎপাদন করেছে? এই দিনে তারা তার হিসাব করে। যার যা ভালো কাপড় আছে তা বের করে পরে। মাও কে দেখবে, তাঁদের বাণী শুনবে। মানুষ যেন পাগল হয়ে গেছে। সমস্ত রাস্তায় রাস্তায় গাড়িতে গাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে দোকানে দোকানে শুধু সুন্দর সুন্দর লাল পতাকা। রুম থেকে যখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলাম, মনে হলো সমস্ত পিকিং শহর যেন জেগে উঠেছে। শুধু লাল, লাল আর লাল। লাল পতাকা দিয়ে ঢাকা সুন্দর পিকিং শহরটা। আমরা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে কাপড় পরে প্রস্তুত হলাম। ৯টায় গাড়ি এলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা এক পাশে শান্তি সম্মেলনের ডেলিগেটরা দাঁড়ালাম, আর এক দিকে রাষ্ট্রদূত ও তাদের অফিসের কর্মচারীবৃন্দ। আমাদের কাছাকাছি একটু পিছনে প্রাসাদের সম্মুখভাগে মাও সে তুং, চৌ এন লাই, চ্যু তে ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ এসে দাঁড়ালেন। মাও যখন এসে দাঁড়ালেন তখন জনতা চিৎকার করে মাওকে অভ্যর্থনা জানালো। প্রথমেই মিলিটারি প্যারেড হলো, নৌ বাহিনী এলো, তারপর বিমান বহর, তারপর পদাতিক, অশ্বারোহী, এমনি করে বিরাট সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্যারেড করে মাও'কে সালাম জানিয়ে চলে গেল।

তারপর শুরু হলো শোভাযাত্রা, পূর্ব দিক থেকে আসছে আর পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। মহিলা ন্যাশনাল গার্ড এলো, যেভাবে প্যারেড করছে মনে হচ্ছে যেন পুরুষের বাবা আর কি! শান্তির জন্য শোভাযাত্রা এলো একটা–কত হাজার লোক

হবে বলা যায় না! প্রত্যেকের হাতে শান্তির পতাকা আর কবুতর। প্রত্যেকে পা মিলিয়ে প্যারেড করতে করতে যাচ্ছে। আর স্লোগান দিচ্ছে দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হোক, মাও সে তুং জিন্দাবাদ, নয়াচীন জিন্দাবাদ। আমাদের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছিল, তখন তারা সমস্ত কবুতর ছেড়ে দিলো। মনে হলো সমস্ত আকাশ কবুতরে ভরে গেছে। দু'একটা এসে আমাদের কাছে পড়লো। আর একটা মাত্র কবুতর ঠিক মাও সে তুংয়ের কাছাকাছি দেওয়ালে বসলো। আমাদের কাছে যে কবুতরটা পড়লো তাকে ধরার জন্য আমাদের মধ্যে ২/১ জন পড়েই গেলেন, মনে হলো বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার ডেলিগেটদের থেকে একজন ধরেছিল।

তারপর শুরু হলো কৃষকদের শোভাযাত্রা—যার যার ইউনিয়নের পতাকা, যে যে জিনিস তারা বেশি উৎপাদন করেছে তাও সকলের হাতে হাতে আছে। কারও হাতে ধান, কারও হাতে অন্য ফল-ফলাদি, কাহারো হাতে কাস্তে-কোদাল। এইভাবে মাঝে মাঝে আবার সান ইয়াৎ-সেনের ছবি বিরাট আকারে কয়েকজন মিলে, মাও সে তুংয়ের ফটো কয়েকজনে, স্ট্যালিনের ফটো, মার্কস—এঞ্জেলস—লেনিন আরও অনেক মনীষী ফটো নিয়ে চলেছে। তবে সকলে পা মিলিয়ে চলেছে। যখন মাও সে তুংয়ের কাছে শোভাযাত্রা উপস্থিত হয় তখন মনে হয় যেন আকাশ ফেটে যাচ্ছে, শুধু মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ। মনে হলো যে লোকগুলি যেন পাগল হয়ে গেছে। একদম শেষে এলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দল। তারা আর এগিয়ে গেল না, একেবারে মাও সে তুংয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল এবং চিৎকার শুরু করলো। সকলেরই সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট আর গলায় লাল রুমাল। হাতে তাদের জাতীয় পতাকা। প্রথমে এসেই সালাম জানালো তাদের নেতাদের, তারপর শুরু হলো জিন্দাবাদ। পাঁচ ঘণ্টা পুরা এই শোভাযাত্রা চললো। একথা মনে করবেন না মিছিল চওড়ায় ৪/৫ জন নিয়া—অন্ততপক্ষে একশত দেড়শত লোক চওড়াভাবে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছে। মনে হলো কোটি লোক হবে। পাঁচঘণ্টা পর্যন্ত মাও সে তুং দাঁড়াইয়া আছেন এবং সালাম গ্রহণ করছেন, এক মুহূর্তের জন্য বসলেন না। আশ্চর্য ধৈর্য! আমি মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাইয়া দেখতাম। হাসি হাসি মুখ, কোনো ক্লান্তি নাই। একটু নড়ছেন, বলেও আমার মনে হলো না।

আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো কত লোক হবে। কেউ বলে ৫০ লক্ষ, কেহ বলে ৪০ লক্ষ, কেহ বলে এককোটি। ৪০ লক্ষের কম কেউ বললো না। আতাউর রহমান সাহেব বললেন, ৩০ লক্ষ তো হবেই। আমি কিন্তু ১৫ লক্ষ বললাম। সকলেই আমার ওপরে ক্ষেপে উঠল। আতাউর রহমান সাহেব আমাকে বললেন, আপনার ধারণাই নেই। কী করবো! শেষ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ লোক শোভাযাত্রা করেছে বলে ধরে নেওয়া গেল। আমিও ভয়েতে ভয়েতে মেনে নিলাম, ভাবলাম যেমন গাদাগাদি করে গেছে হতেও পারে! আর আমরা অনেক নন-কম্যুনিস্ট এসেছি আমাদের দেখাবার জন্যও লোক জোগাড় করে থাকবে! যাহা হোক, কাল সকালে দেখা যাবে—খবরের কাগজে কত লেখা হয়!

আমাদের দেশের অভ্যাস, সরকারি কাগজে যদি এক লক্ষ লেখা হয় তবে আমরা ধরে নিব ২৫ হাজার। কারণ, তার বেশিতো হবেই না। ওটা আমাদের দেশের কাগজআলারা লেখেই থাকে। আমাদের দেশের সরকারি প্রেসনোটেই মাঝে মাঝে লেখে। আর কাগজআলারা কেন লেখবে না? ভাবলাম, এদেশে সরকারি কাগজগুলিও বোধ হয় একই রকম। আর কম্যুনিস্টরা তো একটু বাড়াবাড়ি করেই থাকে। পাঁচ হলে পঞ্চাশ করা তাদের অভ্যাস!

সকালে উঠে দেখি, হায় হায়! কম্যুনিস্ট দেশের সরকারি কাগজ সত্য কথা লেখে! একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। লিখেছে ৫ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা। কোথায় আমরা বলি ২৫ লক্ষ! আর সরকারি কাগজ লেখে পাঁচ লক্ষ। আশ্চর্য হলাম। মিছাই কি এদেশের জনসাধারণ সরকারকে ভালোবাসে?

আমরা ২টায় ফিরে এলাম হোটেলে। খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করলাম। মানিক ভাই তো কম্বল গায় দিলো। এটা তাঁর অভ্যাস, দুপুরে এক পেট খেয়ে একটু ঘুমাইয়া নেয়। যদিও ইত্তেফাকের সম্পাদক হয়ে দুপুরবেলা বিশ্রাম করা তো দূরের কথা, রাত্রেই ঘুমাতে পারে না।

আমরা বিকালে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম। সন্ধ্যার সময় এলাম বাজি পোড়ান দেখতে। ওটার মধ্যে বেশি কিছু বাহাদুরি দেখলাম না। কারণ ওরকম বাজি আমাদের দেশে গ্রামের লোকে অনেক করে থাকে। যা হোক, দেখলাম প্রায় লাখ খানেক লোক নাচানাচি, গান, বাজনা, ফুর্তি ও হুড়াহুড়ি খুব আরম্ভ করেছে সমস্ত জায়গাটায়। কেহ কেহ হাত ধরাধরি করে নাচছে, কেহ উপরের দিকে লাফাচ্ছে। মনে মনে বললাম, পেটে খাবার পড়েছে কি না তাই নাচন এসেছে। চিয়াং কাইশেকের সময় তো এত নাচো নাই? তখনতো ইয়া নফ্‌ছি ইয়া নফ্‌ছি ডাক ছাড়তে! যা হোক, দেখলাম, তারপর ফিরে এলাম–কারণ ভীষণ ঠান্ডা। গরম কাপড় তো খুব ছিল না। আমার জান যায় যায় অবস্থা!

গোটা দুই কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া পড়লাম। পরের দিন সকালবেলা দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রত্যেক বৎসর কি এইভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়? দোভাষী বললো, "জানি না, আপনারা কী ভাবেন। গত বৎসর এর চেয়ে অনেক ভালোভাবে 'লিবারেশন ডে' পালন করা হয়েছিল। এবার সকলেই কোরিয়ার যুদ্ধ ও শান্তি সম্মেলনের জন্য ব্যস্ত ছিল।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "চিয়াং কাইশেকের আমলে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হতো কি না?" বললো, "হতো। মিলিটারির কুচকাওয়াজ, পতাকা উত্তোলন ও সভা এবং বড় বড় বক্তৃতা হতো। এখন আর বেশি বক্তৃতা হয় না।"

নয়াচীনের লোকের স্বাধীনতা দিবস পালন করা যখন দেখতেছিলাম, তখন ১৯৪৭ সালের 'পাকিস্তান দিবসে'র কথা মনে পড়লো। আমরা কলকাতা থেকে ছুটে এলাম। কুঁড়ে ঘর থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদ পর্যন্ত শুধু আনন্দ। মানুষের মুখে

হাসি ধরে না। হাজার হাজার লোক শোভাযাত্রা করেছিল, আকাশ বাতাস মুখরিত করে 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ'—'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠেছিল। সেই দিন দেখেছি মানুষের আনন্দ, আর নয়াচীনে দেখলাম মাও সে তুংকে লোকে যেভাবে ভালোবাসে, কায়েদে আজমকেও লোক সেই ভাবে ভালোবাসতো। হায়! মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আজ আর নাই। তাঁর সাধের পাকিস্তানের জনগণের অবস্থা যদি দেখতেন তবে বোধ হয় নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন।

আমাদের সম্মেলন চলছিল। আমি রাতে মাহবুবের ওখানে মাছ ভাত খাব বলে ফোন করে জানিয়ে দিলাম। বলে দিলাম, কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ, মাছ, ভাত আর যেন কিছু করা হয় না। ফোন ধরেছিলেন মাহবুবের স্ত্রী। আমি বললাম, বাবুর্চি দিয়া পাকান চলবে না, নিজেই চিটাগাংয়ের মতো ঝাল দিয়ে পাক করবেন। বেচারা বললেন, আমিই নিজ হাতে পাক করবো। নিজেই আপনাদের খাওয়াব। সকাল সকাল আসবেন নাকি মাহবুবকে গাড়ি দিয়ে পাঠাইয়া দিবো। আমি বললাম, তাই ভালো হবে।

ঠিক সন্ধ্যার পরে মাহবুব এলো। বেগম সাহেবাকে নিয়ে আসেন নাই, কারণ তিনি পাকে ব্যস্ত আছেন। আমরা তাড়াতাড়ি গেলাম, যেয়ে দেখি মাছ ভাত তো করেছেই, সাথে কিছু গোস্তও পাকাইয়াছে। কী করা যায়! খাওয়া শুরু হলো। আমি কি আর দাঁড়াই, তাড়াতাড়ি ভাজা মাছের থালাটা টেনে নিলাম, সাথে কাঁচা মরিচ আর টমেটোর সালাদ। মানিক ভাইয়ের দিকে চেয়ে দেখি, হায় হায়! খাওয়া শুরু আমার পূর্বেই করে দিয়েছেন। আমি তো জানি মানিক ভাইয়ের সাথে খেয়ে পারবো না, তবে আজ চেষ্টা করে দেখা যাবে। আতাউর রহমান সাহেব ভদ্রলোক, আস্তে আস্তে খাচ্ছেন। আর ইলিয়াস, সর্বনাশ! এটা ধরে ওটা ধরে আর শুধু খায়। যাহোক, মাহবুব ও তার বেগমও আমাদের সাথে খেলেন। তারপর গল্পটল্প করে বিদায় নিলাম।

কত আর খাওয়া যায়! আবার পরের দিন পিকিং করপোরেশন থেকে আমাদের খাওয়ার দাওয়াত। পুরানা রাজপ্রাসাদের ভিতরে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমরা পাকিস্তানিরা এক জায়গায় বসলাম, পীর সাহেব আমাদের টেবিলেই বসলেন। আমরা খাওয়া-দাওয়া করলাম। খাওয়ার পরে সে কী আনন্দ। আমাদের সম্মেলনও শেষ হয়ে গেছে। শীঘ্রই যার যার দেশের দিকে ফিরবে। সকলের কাছ থেকে সকলে বিদায় নিবে। খাওয়ার পরে গান শুরু হলো, ফুর্তি শুরু হলো, কেউ লাফায়, কেউ হৈচৈ করে, কেহ দীর্ঘায়ু কামনা করে। এদেশ ও দেশকে ধন্যবাদ দেয়। সকলে শুভেচ্ছা জানায়।

বের হয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড! হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচের আসর জমেছে। ভারতের নৃত্যশিল্পীরা ভিতরে নাচছে, একদম মাতিয়ে দিয়েছে, হাততালি পড়ছে খুব। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পরে আমরা বিদায় হবো, চেয়ে দেখি রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দাঁড়াইয়া আমাদের অভিনন্দন

জানাচ্ছে, তাদের জাতীয় সংগীত গাইছে। সকলে এক সাথে মাঝে মাঝে ‘মাও সে তুং জিন্দাবাদ’, ‘নয়াচীন জিন্দাবাদ’–‘দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক’ ধ্বনি দিচ্ছে। আর হঠাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কোন দেশ, আমি একজনকে বললাম, ‘পাকিস্তান।’ তখনই আবার শুরু হলো ওদের ভাষায়, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ।’ এই রকম প্রায় আধা মাইল পথ আমাদের আসতে হলো। কোনো কোনো জায়গায় ছেলেরা আমাদের কোলে করে উঁচা করে আবার ছেড়ে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে কী আনন্দ এদের! আধা মাইল পার হতে আমাদের এক ঘণ্টার ওপরে লেগে গেল। আমরা আস্তে আস্তে হোটেলে এলাম। হেঁটেই এলাম, গাড়ির জন্য আর দেরি করলাম না। আতাউর রহমান সাহেব, আমি আর বোধ হয় ইলিয়াস ছিল। মানিকভাই গাড়িতেই চলে গেছেন।

পরের দিন আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই দেশে চলে যাবেন। প্লেনে জায়গা ঠিক করে দেওয়ার জন্য বলে দেওয়া হয়েছে। সে দিন আর হলো না, পরের দিন দুইজন একসাথেই রওয়ানা হলেন। মানিক ভাইয়ের ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে। টাকা-পয়সা দিয়ে আসতে পারেন নাই। তাই তিনি ছুটলেন দেশের দিকে। আর আতাউর রহমান সাহেবের কথা নাই বললাম। কারণ, ভাবির শরীর খুবই খারাপ দেখে এসেছিলেন। আর এটা না বললেই ভালো হয়, তবে বলা যায়, ভাবিকে আতাউর রহমান সাহেব খুব ভালোবাসেন। না দেখে বোধ হয়–থাকতেই পারেন না। কারণ, যত দিন পিকিং ছিলেন সময় পেলেই শুধু ‘ভাবি আর ভাবি।’ আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতাম। রাগ করতেন না আমার ওপরে। আপনারা তো জানেন, মনটা তাঁর খুবই ভালো।

যে-দিন সকালবেলা আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই কামরা থেকে চলে গেলেন তখন আমার মনের অবস্থা আপনারা বুঝতেই পারেন। তবে একদিকে এতদূরে এলাম; নয়াচীন সম্বন্ধে এত কথা শুনলাম, না দেখে চলে যাব? আবার কবে আসবো, জীবনে আর নাও তো আসতে পারি! আর অন্যদিকে দু'জন ঘনিষ্ঠ মানুষ চলে যাচ্ছেন, তাঁদের সাথে শুধু রাজনীতির সম্বন্ধ নয়, তাঁদের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি। তাঁরা চলে যাচ্ছেন–বুঝতেই পারেন কী অবস্থা আমার মনের। কামরাটা আমার খালি হয়ে গেল। আর ঘরে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। আজ হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, আরও কয়েকটা জায়গা দেখব। ইলিয়াস অন্য কোথাও চলে গেল। আমি হাসপাতাল দেখতে গেলাম। স্বাস্থ্যসেবা খাবার এর মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে। আমাদের বললো, রোগ অনেক কমে গিয়েছে। আমরা রোগ হওয়ার পরে চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাতে না হয় তার দিকেই নজর বেশি দিয়েছি। প্রত্যেক বৎসরেই রোগীর হিসাব নিই। তাতে দেখা যায় আস্তে আস্তে, রোগ কমে আসছে। পেটে খাবার পড়েছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে–রোগ বেশি হবে কেন? হাসপাতালটা আধুনিক ধরনের এবং যথেষ্ট উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আছে।

সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশের মতো কেরানি পয়দা করার শিক্ষাব্যবস্থা আর নাই। কৃষি শিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে আমার সাথে আলাপ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মি. হালিমের। তাঁর একটা চীনা নামও আছে, সেটা আমার মনে নাই। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন। তাঁর সাথে প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ হলো। তিনি আমাকে বললেন, বাধ্যতামূলক ফ্রি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। সরকার তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে। কৃষকদের জন্য কৃষি স্কুল করা হয়েছে। আমাকে একটা কৃষি স্কুল দেখান হয়েছিল। সেখানে যুবক কৃষকদের কিছুদিনের জন্য শিক্ষা দিয়ে খামার জমিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শ্রমিকদের জন্য স্কুল করা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্প কেন্দ্রের কাছে স্কুল আছে। বড়দের শিক্ষা দেওয়া হয় কাজের ফাঁকে, আর তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আছে। সকল দিকে খোঁজ নিয়া জানা গেল যে, মাত্র চার বৎসরে তারা শতকরা ৩০ জন লোককে লেখাপড়া শিখিয়ে ফেলেছে। গর্ব করে আমাকে আবার বললো, '১০ বৎসর পরে যদি চীনে আসেন তবে দেখবেন একটা অশিক্ষিত লোকও নাই।'

একটা বিষয় দেখে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এক এক দেশে এক এক প্রকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' ('প্রিভিলেজড ক্লাস') আছে–যেমন আমাদের দেশে অর্থশালী জমিদাররা 'প্রিভিলেজড ক্লাস', অন্য দেশে শিল্পপতিরা 'প্রিভিলেজড ক্লাস'; কিন্তু নতুন চীনে দেখলাম শিশুরাই 'প্রিভিলেজড ক্লাস।' এই প্রিভিলেজড ক্লাসটা সরকারের নানা সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। নয়াচীন সরকারের হুকুম, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হবে, একটা পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছে, সেই পরিমাণ খেতে দিতে হবে। পোশাক ঠিক করা আছে, সেইভাবে পোশাক দিতে হবে। যাদের দেবার ক্ষমতা নাই তাদের সরকারকে জানাতে হবে। সরকার তাদের সাহায্য করবে। নতুন মানুষের একটা জাত গড়ে তুলছে নয়াচীন। ১৫/২০ বৎসর পরে এরা যখন লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে দেশের জন্য কাজ করবে তখন ভেবে দেখুন নয়াচীন কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে? এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দেখে ফিরে এলাম। খাওয়া-পরা পেয়ে নয়াচীনের ছেলেমেয়েদের চেহারা খুলে গিয়েছে। মুখে তাদের হাসি, বুকে তাদের বল, ভবিষ্যতের চিন্তা নাই। মনের আনন্দে তারা খেলছে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে খেলতে হয়, প্যারেড করতে হয়। বিকালে ছোট ছেলেমেয়েদের একটা মাঠে বেড়াতে গেলাম। যেয়ে দেখি প্রায় ২ হাজার ছেলেমেয়ে সমবেত হয়েছে। মেয়ে শিক্ষক তাদের সাথে আছেন। একটা ইউরোপিয়ান মেয়ে শিক্ষকও দেখলাম। প্রথমে প্যারেড করলো, তারপর দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো। কিছুক্ষণ দেখে চলে এলাম। আসতে আসতে ভাবলাম, আমার দেশের হতভাগা ছেলেমেয়েদের কথা। এরা স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯ সালে। এ কথাটি আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে। প্রফেসর হালিম আমাকে বললেন, আমাদের প্রধান কাজ হলো শিক্ষা ও খাদ্য। আর একজন

প্রফেসরের সাথে আমার আলাপ হলো। তিনি আমাকে বললেন, কী করে পিকিং শহর কম্যুনিস্টরা দখল করলো। তিনি বললেন যে, আমি শহরে ছিলাম। কম্যুনিস্ট বা অন্য কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না। আমার কোনো শত্রুও নাই, লেখাপড়া করি আর লেখাপড়া করাই–এই হলো আমার ধর্ম।

লালচীন সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক রেডিওতে ঘোষণা করলো, 'আমরা ইলেকট্রিক সরবরাহ কেন্দ্র ও পানি সরবরাহ কেন্দ্র দখল করেছি। জনসাধারণকে কষ্ট দিবার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি না। আমাদের সংগ্রাম জনগণের সংগ্রাম, আমাদের সৈন্যবাহিনীর নাম জনগণের সৈন্যবাহিনী। জুলুমের ও অত্যাচারের হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে চাই। আমরা ইলেকট্রিসিটি ও পানি বন্ধ করলাম।' এদিকে তো পালানো শুরু হয়েছে। হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছে–বিশেষ করে শোষক বড়লোক, অর্থশালী আর অত্যাচারী, অনেক গরিবও পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু গরিবদের পালাবার উপায় নাই। চিয়াং কাইশেকের উড়োজাহাজ বড় লোকদের নিয়ে যাচ্ছে। এক একটা ফ্যামেলি পার করতে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। ২/১ দিনের মধ্যেই পিকিং শহরের পতন হবে। কারণ তিন দিক দিয়ে আক্রমণ হবে। একদিক খোলা, সে পথ দিয়ে চিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনী আর স্বৈরাচারীরা পালাতে আরম্ভ করলো। সমস্ত শহরে হৈচৈ পড়ে গেল।

প্রফেসর বললেন, রাস্তায় বের হলাম, দেখি সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি করছে ধনীলোকেরা। অল্প টাকায় বাড়িও বিক্রি করছে, কেউ দোকান, কেউবা অন্য কিছু। আমি বইয়ের দোকানের কাছে গেলাম, দেখি সকলের চেয়ে বড় যে দোকান তার বই বিক্রি করবে বলে ঘোষণা করছে। খদ্দের কোথায়? সকলেরইতো ইয়া নফছি ইয়া নফছি। আমি ভাবলাম, সারা জীবনভর যে সামান্য অর্থ জমা করেছি তা দিয়ে এই সুযোগে বই কিনে রাখি। আমি বই বাছতে আরম্ভ করলাম।

দোকানদার বললেন, "বেছে লাভ নাই, সমস্ত বই কত টাকা দিবেন বলেন?" আমি বললাম, "আপনি কত চান তাই বলুন।" তিনি উত্তর করলেন, "আমার এমনিই ফেলে যেতে হবে। এই জালেম কম্যুনিস্টদের রাষ্ট্রে আমি থাকবো না। আজই আমি পালাব, ছেলেমেয়ে পাঠাইয়া দিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় দিয়ে বইগুলি নিয়ে নেন।" সামান্য অর্থে বইগুলি আমি পেলাম। আরও ঘুরে কিছু বই কিনলাম। আজ সমস্ত পিকিংয়ের মধ্যে আমার লাইব্রেরিটি বড়। আমি বই বিক্রি করি না। ওটা আমার নিজস্ব পড়বার লাইব্রেরি। এখন পাবলিক আমার লাইব্রেরিতে এসে লেখাপড়া করতে পারে এবং অনেকে পড়েনও। আর যত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বই ছিল, "আমি গরিব শিশুদের বিলিয়ে দিয়েছি।" তিনি আরও বল্লেন, বিপ্লবে আমার জীবনের একটা আশা পূর্ণ হয়েছে, সে হলো লাইব্রেরি। বহুদিন থেকে ভাবতাম, আমার একটা নিজস্ব বড় লাইব্রেরি চাই। সে আশা পূর্ণ হলো।

আমি একটু হাসলাম দেখে বেচারা বললেন, দেশের উত্থান পতনের সময় অনেক ঘটনা এ রকম হয়ে থাকে। আমি বললাম, দেশের এইরকম ঘটনার সময় অনেকেরই সুযোগ জুটে যায়। বেচারা এ কথার আর উত্তর দিলেন না। আমিও একটু লজ্জা পেলাম।

পিকিং শহরে একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকাই যে জীবাণু বোমা ছেড়েছে তাতে যে ক্ষতি হয়েছে তার কিছু প্রমাণ জোগাড় করে রাখা হয়েছে। অনেকগুলি ফটো, কিছু জীবাণু, কিছু অসুস্থ মানুষের ছবি, কিছু লাশের ছবি। আর আমেরিকার কয়েকজন সৈন্যের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা এবং হাতের লেখা—কী করে তারা জীবাণু বোমা ব্যবহার করেছে, চীন ও কোরিয়ার বর্ডারে। আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস হলো যে, এ রকম বোমা ছেড়ে থাকতেও পারে! কারণ আমেরিকাই একদিন যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য জাপানের দুইটা শহর—হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বম ছেড়ে লক্ষ লক্ষ লোককে মেরে ফেলেছিল। এখন তারা যুদ্ধের জন্য হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করছে। এটা তো আর এটম বোমার চেয়ে শক্তিশালী বেশি না, তবে এটম বোমার ধ্বংস দেখা যায়, আর এ বোমা মারার পরে আস্তে আস্তে জনসাধারণ নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়।

যাক বাবা, আমেরিকার বিরুদ্ধে সত্যকথা লিখে বিপদে পড়তে চাই না, কারণ আজ আমেরিকা পাকিস্তানের 'একমাত্র বন্ধু।' এক মুসলিম লীগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলেই প্রত্যেক বৎসর জেল খাটি। আবার এদের বিরুদ্ধে বলে কি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবো? দরকার নাই বাবা আর যা দেখেছি তাই লেখি।

আগামী দিন সকালেই আমাদের পিকিং ছাড়তে হবে, আমরা তিয়ান সিং রওয়ানা হবো। সন্ধ্যায় আমার দোভাষী মিস ফু-কে ডেকে বললাম, যাবার ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে কি না? মিস ফু বললেন, কাল সকালে আপনারা ট্রেনে তিয়ানজিং যাবেন, মাত্র ৫ ঘণ্টা লাগবে। আমরা একটা দল ঠিক করেছিলাম। সে দলটির নেতা পীর মানকী শরীফ, খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর, সিন্ধুর জি এম সৈয়দ, ইলিয়াস, আমি ও আরও অনেকে—বলতে পারেন নন-কম্যুনিস্ট দল।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় মাহবুবের বাসায় যাই। সকলের সাথে বিদায় নিতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রদূতের অফিসের অনেকের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মাহবুবের স্ত্রী তো ভেবেই অস্থির। বেচারির চেহারার অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ হলো। বোধহয় দূরদেশে থাকে, আমাদের পেয়েছিল—ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। খুব শীত পড়েছে। আমার গরম কাপড় বেশি নাই দেখে বেচারি তার স্বামীর সমস্ত কাপড় বের করে আমাকে বললেন, "মুজিব ভাই যে কাপড় আপনার গায়ে লাগবে, নিয়ে যান।" আমি বললাম, মাহবুব আমার চেয়ে লম্বায় প্রায় ৪ ইঞ্চি ছোট। ওর কাপড় আমার লাগবে কেন? সে কি আর শোনে, এটা গায় দেওয়ায় ওটা গায় দেওয়ায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একটাও লাগে না।

বেচারির মুখ কালো হয়ে গেল। যাহোক, না খেয়ে আর আসতে দিবে না। যাই খেয়ে নিলাম ওখানেই। তারপর বিদায়ের পালা। মাহবুবের স্ত্রী তো কেঁদেই ফেললো। আমাকে বললো, আমাকে পৌঁছার সংবাদ দিবেন। আমরা একসাথে ফটো তুলেছিলাম তা আমাকে পাঠিয়ে দিবে বলে কথা দিলো। আমিও দেশে এসে চিঠি দিয়াছিলাম, আর উনিও দয়া করে ফটো পাঠিয়ে দিয়াছেন।

ফিরে এসে একটা দু'টার বেশি চিঠি লেখি নাই। কারণ মাহবুব চাকরি করে, আর আমি জেল খাটি। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও লীগ আমলে রাখা উচিত না। বিপদের সম্ভাবনা থাকে এজন্য যে সে বেচারা চাকরি করে। কোনো লীগবিরোধী দলের নেতা বা কর্মীর যদি আত্মীয় চাকরি করে, আর সে যদি খুব ভালো, সত্যবাদী কর্মচারীও হয়, তবু তার ওপরও অত্যাচার করার নজির লীগ আমলে আছে। তাই ওদের কাছে আর চিঠি লেখি নাই।

বড় কষ্ট হলো ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। কী করবো, দেশে ফিরে যে আসতেই হবে! যে দেশের মা-বোনরা না খেয়ে মরে সেই আমার জন্মভূমিতে।

রাত ৮টায় হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানে একটা গানের জলসা ছিল–বসে গান শুনলাম, নাচ দেখলাম। তারপরে রুমে যেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে প্রস্তুত হলাম। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পিকিং শান্তি কমিটি বহু উপহার দিয়াছিল, সেগুলি সব বাক্সের ভিতর ঠিকঠাক করে নেয়া হলো। ৪টার সময় গাড়ি হাজির, আমরা রেলস্টেশনে গেলাম; যেয়ে দেখি চীন জাতীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মি. বোরহান শহীদ, প্রফেসর হালিম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমাদের বিদায় সংবর্ধনা দেবার জন্য উপস্থিত। আমরা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বোরহান শহীদ ও প্রফেসর হালিম আমাকে বললেন, দেশে সকলকে আমাদের কথা বলবেন। আমাদের শুভেচ্ছা রইল। নয়াচীন সরকার জনগণের সরকার। আমরা খুব সুখেই আছি।

আমরা যথারীতি বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। বোরহান শহীদ চীনের মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের একটা বই উপহার দিলেন। তার মধ্যে মুসলমানদের মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও অনেক বিষয়ের ফটো আছে। আমার মনটা সত্যই খুব খারাপ লাগলো। এদেশের লোকের মনে অহংকার নাই। সকলকেই আপন করতে চায়। সকলেই মনে করে 'রাষ্ট্র আমাদের', একে গড়ে তুলতে হবে। গাড়ি ছেড়ে দিলো। আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। মনে হলো সকলেই আমার মতো বেদনা অনুভব করছে।

আমরা তিয়ানজিং শহরে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় ১টা। আমাদের ঐভাবেই সংবর্ধনা করলো এবং ভালো হোটেলে নিয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম, তারপর বেরিয়ে পড়লাম শহর ও শিল্প দেখতে। এই শহরটা একটা

শিল্পশহর এবং এর কিছু দূরেই একটা বিরাট পোর্ট রয়েছে। এটা চীনের নামকরা শিল্পনগরী। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এখানে বহুদিন থেকে। এবং এর ওপর দিয়া ঝড়-ঝাপটা বহুত গিয়াছে। জাপানিরা এটা দখল করে নিয়েছিল। চিয়াং কাইশেকের হাতেও এ শহর বহুকাল ছিল। কিন্তু কেউই যুদ্ধে হেরে শহর ত্যাগ করে যাওয়ার সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে যায় নাই। জাপানি অধিকারের সময় কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল, তবে খুব বেশি না। এখানে কাপড়ের সুতা, লোহা, ঔষধের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। শ্রমিকদের জন্য ভালো ভালো থাকার বাসস্থান করা হয়েছে। আলাদা হাসপাতাল করা হয়েছে। আমরা শ্রমিকদের জন্য যে হাসপাতাল করা হয়েছে সেটা দেখতে যাই। এই হাসপাতালটা ঠিক করতে ২ বৎসর লেগেছে। আমি যখন দেখি তখন কিছু কিছু কাজ বাকি আছে। আমাকে বললো, আরও তিনমাস সময় আমাদের লাগবে। আমরা প্রত্যেক কামরা দেখেছি। সাধারণ ব্যারাম থেকে আরম্ভ করে কলেরা ও বসন্ত ডিপার্টমেন্ট দেখলাম। আমাদের একজনের দাঁতের বেদনা হয়েছে। আমরা সামান্য অপেক্ষা করে তার দাঁতটা দেখিয়ে নিলাম। ঔষধ লাগিয়ে দিলো এবং কিছু ঔষধ সাথে দিয়া দিলো। দাঁতের রোগটা ভালো হয়ে গেল দুই-তিন দিনের মধ্যে। আমরা কয়েকটা শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখতে গেলাম। সেদিন শ্রমিকদের ছুটির দিন, কারখানা বন্ধ। সপ্তাহে একদিন শ্রমিকরা ছুটি পায়। এখানে একজন রাশিয়ার Expert-কে দেখতে পাই। ইনি লোকাল শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও শিল্পের যাতে উন্নতি হয় তার পরামর্শ দেন। আমরা সন্ধ্যার পরে ফিরে আসি হোটেলে। বেশি সময় এখানে ছিলাম না। শিল্প সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করবো। রাতে আমরা হোটেলে রইলাম। খুব ঠান্ডা বলে ১০টার পরে আর বের হতে পারলাম না।

এখানকার শান্তি কমিটি আমাদের একটা ভোজ দিলো আর সেই সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র উপহার। চীনে খাওয়া আর উপহার এটা আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের পক্ষ থেকে পীর সাহেব ধন্যবাদ দিলেন। এখানে জামে মসজিদের ইমাম সাহেব, আমাদের যে ভোজসভা দেয়া হয়েছিল–সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছোটখাটো লোকটা, মাথায় টুপি, অল্প কয়েকগাছা দাড়ি, চীনা প্যান্ট কোট পরা। 'আস্‌সালামু আলাইকুম' দিয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি পীর সাহেবের পাশে বসলেন। ফারসি জানেন, দু'জনেই ফারসিতে আলাপ করলেন। কী আলাপ করলেন তখন বুঝতে পারলাম না। পরে পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, অনেক কথা বললো। তার মধ্যে মূল কথাটুকু হলো যে, ধর্ম কাজে এরা কোনো বাধা দেয় না। আমরা আমাদের ইচ্ছামতো নামাজ রোজা করতে পারি। ছেলেমেয়েদের কোরআন হাদিস পড়াতে পারি, কোনো অসুবিধা নাই। আমি বললাম, তাহলে আমরা যা শুনেছি তা মিথ্যা। পীর সাহেব হেসে বললেন, "সত্য মিথ্যা খোদা জানেন।"

পরদিন সকালে আমরা নানকিং রওয়ানা হলাম। নানকিং শহর চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। পূর্বে এটা চিয়াং সরকারের সময় রাজধানী ছিল। শহরটা অনেক পুরাতন এবং অনেক স্মৃতি এর সাথে জড়িত। এখানে চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ-সেনের কবর আছে। চীনারা একে পুণ্যস্থান বলে মনে করে। বহু রাস্তা ঘাট পার হয়ে আমরা নানকিং এ পৌঁছলাম। আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হলো হোটেলে। আমরা খেয়ে বিশ্রাম নিলাম, কারণ রাতে সেখানে পৌঁছেছি।

সকালে আমরা বের হলাম দর্শনীয় স্থান দেখতে—যা দেখার যোগ্য। প্রথমেই আমরা গেলাম চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ-সেনের কবর দেখতে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। আমরা ফুল কিনে নিলাম। সকলে তাঁর কবরে ফুল দিলাম। কবরটা শহর থেকে ২/৩ মাইল দূরে। অনেক উঁচু করে পাহাড়ের উপর কবরটা দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২ শত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। চারিদিকে ফুলের বাগান। ছোট ছোট গাছ। প্রায় ১ মাইলের ভিতর বাড়ি ঘর নাই। উপরে দাঁড়াইয়া এত সুন্দর মনে হয় যে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। কারণ আমি লেখক নই; অনুভব করতে পারি মাত্র, লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা খোদা আমাকে দেন নাই। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে রইলাম, তারপর তাঁর মৃত আত্মার জন্য শান্তি কামনা করে বিদায় হলাম। মনে হলো সারাদিন যদি ওখানে থাকতে পারতাম তবে প্রাণভরে সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে ও উপভোগ করতে পারতাম।

ওখান থেকে একটা কৃষি ফার্ম দেখতে গেলাম। চীন সরকার কৃষির উন্নতি করছে—মাথাভারী ব্যবস্থার ভিতর দিয়া নয়, সাধারণ কর্মীদের দিয়া। বিরাট ফার্ম, সেখানে বীজ তৈয়ার করা হয় এবং দেশের ভিতর সেই ভালো বীজ ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়। কৃষি শ্রমিকদের সুবিধাও অনেক। আমাদের দেশের সরকারি কৃষি ফার্মগুলিতে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয় মাথাভারী ব্যবস্থার ফলে। বিরাট জায়গা নিয়ে এই ফার্মটা করা হয়েছে। সেটা দেখার পরে অনেক পুরানো স্মৃতি আমাদের দেখালো। আমার কিন্তু পুরানো আমলের ভাঙা বাড়ি দেখার ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমি দেখতে চাই কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, সাধারণ মানুষের উন্নতি। তবু মাঝে মাঝে দেখতে হয়। কারণ অনেক স্মৃতির সাথে পুরানো আমলের মুসলমান সম্রাটদের স্মৃতি জড়িত আছে। মোগল পাঠান আমলের যে সব স্মৃতি আমরা দেখতে পাই আগ্রা, আজমীর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, সেকেন্দ্রা, লাহোরে-তার সাথে চীনের অনেক পুরানো কারুকার্যের মিল আছে।

নানকিং শহর নদীর পাড়ে। এখানে জাহাজে করে প্যাসেঞ্জার ট্রেন পার করা হয়। নামতে হয় না প্যাসেঞ্জারদের। ট্রেনটা এপার থেকে জাহাজে ওপারে চলে যায় আমরা দেখতে পেলাম। পীর সাহেব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইরা নদীর পাড়, বিরাট নদী, নদীর পাড়ে কারখানা, নদীর ঢেউ দেখতে ভালোবাসে।

কারণ পাঞ্জাব ও সীমান্তের ভাইদের কপালে এ সমস্ত কম জোটে। আমরা পূর্ব বাংলার লোক নদীর পাড়ে যাদের ঘর, নদীর সাথে যাদের বন্ধুত্ব, ঢেউয়ের সাথে যাদের কোলাকুলি, তারা কি দেখতে ভালোবাসে এগুলি? তাই পীরসাহেবকে বললাম, চলুন, বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। খাবার সময় প্রায় হয়ে এলো। আমরা হোটেলে ফিরে এসে খেলাম, তারপর আবার বেরিয়ে পড়লাম নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে।

বিশ্ববিদ্যালয় তখন বন্ধ ছিল। ভাইস-চ্যান্সেলর ও কয়েকজন প্রফেসর এবং কিছু ছাত্র–যারা খোঁজ পেয়েছিল, উপস্থিত হয়েছিল। খাওয়ার জোগাড়ও করেছিল খুব। আমরা ক্লাসরুম দেখলাম, বিজ্ঞান শাখা দেখলাম, বিদেশি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট দেখলাম। আমাদের একটা হলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ফুল-ফলে টেবিলটা বোঝাই। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের বক্তৃতায় ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কত, প্রফেসর কত, সরকার কীভাবে সাহায্য করছে, কয়টা নতুন ডিপার্টমেন্ট খোলার জন্য দালান করা হতেছে ইত্যাদি। আমরা 'দয়া করে' এসেছি সেজন্য যথেষ্ট কৃতার্থ হয়েছেন। পাকিস্তান ও চীন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুক। দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন।

আমাদের দলনেতা পীরসাহেব বক্তৃতা করলেন : "আমরা পাকিস্তানি, ইসলাম ধর্মে অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী, ইসলাম অর্থ শান্তি, আমরাও চাই দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক। অত্যাচার, অবিচার দুনিয়া থেকে মুছে যাক। আমরা যে স্নেহ ও ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে পেলাম তা কখনও ভুলবো না। যে কষ্ট করে আপনারা আমাদের সকল কিছু দেখালেন, সে জন্য আমি আমার ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পাক-চীন বন্ধুত্ব কায়েম থাকুক।" পীর সাহেব উর্দুতে বললেন, সীমান্ত আওয়ামী লীগের সম্পাদক ফজলুল হক সাহেদা, যিনি তা ইংরেজি করে দিলেন।

ভাইস চ্যান্সেলর চীনা ভাষায় বললেন, দোভাষী ইংরেজি করে দিলেন। এখানেই আমি দেখলাম যে, দোভাষী যখন ২/১ জায়গায় ভালোভাবে ইংরেজি করতে পারছে না, সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর নিজেই ওকে ইংরেজি করে দিচ্ছে। ভদ্রলোক ভালো ইংরেজি জেনেও ইংরেজি বলেন না। জাতীয় ভাষায় কথা বলেন। আমরা বাঙালি হয়ে ইংরেজি আর উর্দু বলার জন্য পাগল হয়ে যাই। বলতে না পারলেও এদিক ওদিক করে বলি।

আমরা যখন ইউনিভার্সিটি দেখা শেষ করে বিদায় নিলাম, রাস্তার বড় ছেলেমেয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে–প্রায় সকলেই ছাত্র, আমাদের 'হোপিন ওয়ানশোয়ে' বলে বিদায় সংবর্ধনা জানালো। আমরা 'দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক' বলে বিদায়ের উদ্যোগ নিতেই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কারণ, ওদের আমি একটু ঠাট্টা করেছিলাম, মুখ ভেঙচিয়া

দিয়াছিলাম। ওরা মনে করলো, ‘পেয়েছি মনের মতো লোক।’ তাই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি ওদের সাথে কিছু খেলা করে রওয়ানা হলাম। আমার বন্ধু-বান্ধবরা আগেই গাড়িতে উঠে বসে রয়েছে। মনে মনে বিরক্ত হলো বলে আমার মনে হলো। কিন্তু কী করবো? ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দময় সঙ্গ যেন হুট করে ছেড়ে আসা যায় না, আর আমার স্বভাবও সে রকম না। ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে আমি ভালোবাসি।

পরে আরও কয়েকটা ভালো ভালো জায়গা এবং বাজারের অবস্থা দেখে আমরা রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মেয়র ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। আমরা আমাদের জায়গামতো ঠিক হয়ে বসলাম। আমি কখনই পীর সাহেবের টেবিলে বসতাম না, কারণ বড় বড় নেতারা সেখানে তাঁর কাছে বসবেন। কিন্তু তিনি আমাকে সকল সময় তাঁর পাশে বসতে অনুরোধ করতেন। আমি তাঁকে একদিন বুঝাইয়া দিলাম যে, আমার আলাদা টেবিলে বসা উচিত। কারণ আমি সাধারণ লোকদের কাছে বসলে বেশি কিছু জানতে পারবো। তাদের কাছে ওকালতি করে কিছু বের করতে পারবো। সত্য কথা বলতে কী আমি সকল সময় তাদের দোষত্রুটি ধরবার চেষ্টা করতাম। তাদের কাছ থেকে কথার পর কথা জিজ্ঞাসা করে কিছু বের করতে চেষ্টা করেছি।

খাবার আগে যথারীতি বক্তৃতা শুরু হলো। শহরবাসীর পক্ষ থেকে মেয়র বক্তৃতা করলেন। আমাদের পীর সাহেব উত্তর দিলেন। বক্তৃতার বিষয় আর লেখলাম না। কারণ উপরে আরও দুই একটাতে কিছু কিছু লিখেছি, তাতেই আপনারা বুঝতে পারবেন। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা ছাড়া উপায় নাই। পীর সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, “কিছু বলো।” আমি বললাম, “মাফ করবেন। বিদেশে কী বলতে কী বলে ফেলি ঠিক নাই। আমার বক্তৃতার কাজ নাই। মনে মনে ভাবি পল্টন ময়দান হলে, আমি পারি।” অনেক কষ্টে বক্তৃতা দেওয়ার লোভটা কাটাইয়া উঠলাম। আমাদের পরে অনেক জিনিস উপহার দেওয়া হলো। চীনের লোক শুধু উপহার দেয়ার জন্য ব্যস্ত। এত ভদ্রতা এই জাতটার– আগে জানতাম না।

পরের দিন আমরা সাংহাই রওয়ানা হলাম। সাংহাই শহর দুনিয়ার দ্বিতীয় শহর নামে পরিচিত। লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। চীনের শ্রেষ্ঠ শহর। আমরা এখানে দুইদিন থাকবো। বহু পথ ঘাট পার হয়ে আমরা সাংহাই পৌঁছলাম। আমাদের শ্রেষ্ঠ হোটেল কিংকং এ রাখা হলো। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা রুম। ওখানে যেয়ে আমরা ভারতীয় ডেলিগেট কয়েকজনকে পেলাম, তার মধ্যে মি. ফরিদীর সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হলো। মি. ফরিদী আমাদের পূর্ব বাংলার বার্মা শেলের জেনারেল ম্যানেজার মি. ফরিদীর ভাই। দুইজনই ‘ফরিদী’ নামে পরিচিত। তিনি আমাকে বললেন, “শীঘ্রই আমি ভাইয়ের কাছে ঢাকায় যাবো।” আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, যখন যাবেন আমাকে দয়া করে খবর দিবেন।

আমার ঠিকানা পেতে বেশি অসুবিধা হবে না।” আওয়ামী লীগের অফিস-ঠিকানা তাঁকে দিয়াছিলাম। ফেরার পথে আমরা একসাথেই হংকং পর্যন্ত এসেছিলাম।

সাংহাইতে দেখার জিনিস অনেক আছে। আমরা প্রোগ্রাম ঠিক করে নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই আমরা দেখতে গেলাম চীনের বড় এক কাপড়ের কল। চীনারা দাবি করে এই কলটা এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি জানি না বলে মতামত দিতে পারবো না, তবে খুব বড় কারখানা সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। দেখতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই মিলটা একটা কোম্পানির, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমস্ত কিছু দেখাশোনা করেন। আমরা যে শুনেছিলাম, চীনে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এটা দেখে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমাদের সংবর্ধনা জানানো হলো। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি পাশাপাশি বসেছেন। যিনি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তিনিও একজন শ্রমিক। মিলগুলি জাতীয়করণ না করেও এমন বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, ইচ্ছামতো লাভ করা চলে না। সরকারকে হিসাব দাখিল করতে হয়। যে টাকা আয় হবে তা শ্রমিকদের বেতন, তাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত, চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করতে হবে। আর যা বাঁচবে তা দিয়ে মিলের উন্নতি করতে হবে। আর যারা মালিক তাদের লভ্যাংশের কিছু অংশ দেওয়া হয়।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও মালিকদের একমত হয়ে এসব ঠিক করতে হয়। আমরা দেখে আনন্দিত হলাম, মেয়ে শ্রমিকরা যখন কাজে যায় তখন তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য মিলের সাথে নার্সিং হোম আছে। কাজে যাওয়ার সময় ছেলেমেয়েদের সেখানে দিয়ে যায় আর বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যায়। যে-সমস্ত শ্রমিক বিবাহ করে নাই তাদের জন্য বিরাট বিরাট বাড়ি আছে। সেখানে আমাদের দেশের ছাত্ররা যেমন এক রুমে তিন চার জন থাকে, তেমনি অবিবাহিত যুবকরাও থাকে। যুবতিদের জন্যও একই রকম ব্যবস্থা আছে। একটা দালানে মেয়ে শ্রমিকরা থাকে, তাদের বাড়িটা আমরা দেখতে গেলাম। এক রুমে তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সিট দেখলাম। অনেক ঘরে আবার ট্রেনের প্রথম শ্রেণির ওপরে নিচে যেমন সিট থাকে তেমনিই আছে। বলতে পারেন কোনোমতে চলে যায়, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে।

শ্রমিকদের জন্য আলাদা হাসপাতাল আছে। অসুস্থতার সময় বেতনসহ ছুটি দেওয়া হয়। বৎসরে তারা একবার ছুটি পায়। যারা বাড়ি যেতে চায় তাদের বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়, আর যারা স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে চায় তাদেরও ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল আছে।

মিলটা দেখে যখন আমরা বিদায় নিবো তখন শ্রমিক ও মালিকদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা সভার আয়োজন করা হলো। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বক্তৃতা

করলেন, শ্রমিক প্রতিনিধিও বক্তৃতা করলেন। তারা উভয়েই বললেন, "আমরা শ্রমিক ও মালিক পাশাপাশি দেশের কাজ করছি। মিলটা শুধু মালিকের নয়, শ্রমিকের ও জনসাধারণেরও। আজ আর আমাদের মধ্যে কোনো গোলমাল নাই। আমরা উভয়েই লভ্যাংশ ভাগ করে নেই। শ্রমিকের স্বার্থও আজ রক্ষা হয়েছে, মালিকের স্বার্থও রক্ষা হয়েছে। চিয়াং কাইশেকের আমলে আমাদের মধ্যে তিক্ততা ছিল। মাঝে মাঝে মিল বন্ধ রাখা হতো। আমাদেরও ক্ষতি হতো আর শ্রমিকদেরও ক্ষতি হতো।" এখানে পীর সাহেব বক্তৃতা করলেন। আর আমাকে বললেন, কিছু বলতে। বাধ্য হয়ে আমিও কিছু বললাম, তাদের ধন্যবাদ দিলাম। বললাম তারা যে সুখে আছে সে জন্য আমরা খুবই সন্তুষ্ট। আমাদের যে দেখতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার জন্যও তাদের ধন্যবাদ দিয়ে চা ফল ফলাদি খেয়ে আমরা বিদায় নিলাম। আমাদের দোভাষী চীনা ভাষার বক্তৃতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। দুপুরবেলা খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি, শ্রমিকদের জন্য যে কলোনি করা হয়েছে তা দেখবার জন্য। দু'মাইল লম্বা বিরাট কলোনি করা হয়েছে, আরও অনেকগুলি হচ্ছে। তার মধ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল করা হয়েছে। আমরা যখন গেলাম তখন স্কুল চলছিল। একটা ক্লাসে ঢুকলাম, ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মান দেখালো। আমরা ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল দেখতে গেলাম।

তারপর গেলাম শ্রমিকদের বাজার দেখতে। যাবতীয় মালপত্র সেখানে আছে, দাম করতে হয় না। যার যা প্রয়োজন টাকা দিয়ে নিয়ে চলে আসে। দেখলাম, বহুলোক বাজার করছে। পুরুষ মেয়ে একসাথেই বাজার করে, জিনিসপত্র বিক্রি করে। সে দেশে পুরুষ কাজ করে আর মেয়েরা বসে খায় না। পুরুষ ও মেয়ে সমান, এই তাদের নীতি। হাজার হাজার শ্রমিক পুরুষ ও শ্রমিক মেয়ে রয়েছে। প্রায়ই শ্রমিকদের মধ্যেই বিবাহ হয়। বিবাহ হলেই তারা থাকার মতো বাড়ি পায় এবং কিছু দিনের জন্য ছুটি পায় আমোদ করার জন্য। তারপর আবার কাজ শুরু করে। বিবাহের পরেই যদি ছুটি দিতে না পারে তবে একসাথে বৎসরের ছুটির সময় দিয়া দেয়। আমরা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠে গেলাম। দেখলাম বহু ছেলেমেয়ে খেলছে, তাদের সাথে মাস্টারও আছেন। আমি যেই সেখানে গেলাম আর যায় কোথায়! শুরু হলো স্লোগান। আমার ক্যামেরা দিয়া যখন ফটো নিতে চাইলাম তখন সমস্ত ছেলে মেয়েরা লাইন বেঁধে দাঁড়াইয়া গেল। কেউ কেউ সামনে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করছে। যাকে বলা হয় ঠেলাঠেলি করে আগে আসা।

তারপর নতুন বাড়িগুলি দেখতে লাগলাম। আমার একটা খেয়াল হলো, শুধু ওপরে ওপরে দেখা না, একটু ভিতরে দেখতে হবে। ইলিয়াস, ফজলুল হক সাহেদা আর আমি একসাথে ছিলাম। আর পীর সাহেব ও অনেকে অন্য দলে ছিলেন। আমি কলোনির একটি বাড়ির কাছে যেয়ে আমাদের দোভাষীকে

বললাম, "দেখুন এ বাড়ির ভিতরটা আমরা দেখতে চাই।" পূর্বে যদি বলতাম, বাড়ির ভিতর দেখব তবে কোনো একটা ঘর ঠিকঠাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতো হয়তো। তাই আগে কিছুই বলি নাই।

দোভাষী আমাকে বললেন, "একটু দয়া করে আপনারা বাইরে দাঁড়ান, আমি ভিতরে খবর দিয়ে আসি।" কথা ঠিক, কারণ যার বাড়ি যাব তাকে খবর না দিয়ে ঢুকে পড়ি কী করে? কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন এবং আমাদের নিয়ে ভিতরে গেলেন। যাবার সময় দোভাষী মিস লী আমাদের বললেন, দেখুন যে বাড়িতে আমরা যাচ্ছি সে বাড়ির পুরুষ কারখানায় কাজ করতে গেছে, তার স্ত্রী আছেন। এদের দু'জনের ৩/৪ দিন হলো বিবাহ হয়েছে। দু'জনেই শ্রমিক। আমরা বললাম যে, তা হলে বিয়ে বাড়িতে এলাম! বলতে বলতে ঢুকে পড়লাম। ভদ্রমহিলা আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। আমাদের বসতে দিলেন। ঘরটা দেখে আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ, শ্রমিকদের থাকবার ঘরে এত ভালো ভালো আসবাবপত্র। একটা খাট, একটা টেবিল, দুইখানা চেয়ার, একটা আলমারি, কয়েকটা বাক্স। একটা চেয়ার কম ছিল বলে একটা মোড়া এনে দিলো।

ভদ্রমহিলা লাজুক হয়ে পড়েছেন, কারণ তার স্বামী বাড়িতে নাই। দুঃখ করে বললেন, আপনারা এলেন আমাদের গরিবের বাড়িতে আমি কী করবো কিছুই তো বাড়িতে নাই? কাকে দিয়ে আনাই। তারপর আমাদের জন্য চিং চা বানাইয়া দিলেন। ওটা চীনাদের সকল বাড়িতেই থাকে। আমরা চা খেতে খেতে আলাপ করলাম। তাদের সংসার খুব সুখের হবে বলে আশা করেন। বিবাহের কথা যখন ট্রেড ইউনিয়নকে জানিয়েছিল তখনই তারা এই ঘরটা দিয়েছে। কয়েকদিন হলো এ ঘরে তারা এসেছে। এখনও ভালো করে সংসার পাততে পারে নাই। আমার তো শ্রমিকের ঘরের আসবাবপত্র দেখে একটু আশ্চর্যবোধ হলো। কারণ, আমাদের দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা তাহা কল্পনা করলে আর ওদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া উপায় কী?

আমরা এক মুশকিলে পড়ে গেলাম, বিবাহ বাড়িতে গিয়েছি কিছু উপহার না দিয়ে কী করে ফিরে আসি। আমাদের এত যত্ন করেছে চীনের জনসাধারণ, খাওয়া-দাওয়া থাকা যাবতীয় বন্দোবস্ত করেছে আমাদের। ইলিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোর কাছে কিছু আছে? বললো, না। ফজলুল হককে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাছে কিছু? বললো, না। একটু সুবিধা ছিল বাংলা ও উর্দুতে কথা বললে বোঝার উপায় নাই। আমি ভাবছিলাম, হঠাৎ আমার হাতের দিকে খেয়াল পড়লো—দেখি আমার তো একটা আংটি আছে। আমি খুলে সেই শ্রমিকের স্ত্রীকে উপহার দিলাম। দোভাষীকে বললাম, পরাইয়া দিতে। কিছুতেই গ্রহণ করতে চায় না, তারপর নিল। আমরা ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার সময় আমরা বাজারে গেলাম কিছু জিনিসপত্র কিনবো। সাংহাই শহরে নিশ্চয়ই জিনিসপত্র সস্তা। সরকারি দোকানে গেলাম, বিরাট চারতলা দালান।

যা দরকার সব ওখানেই পাবেন। আমি একটা সুটকেস কিনলাম, কারণ যা উপহার পেয়েছি, তা নিতে হলে একটা সুটকেসের দরকার। কিছু কিছু সস্তা জিনিস কিনলাম। পকেটের অবস্থা তো খারাপ, হংকং-এ কিছু কিনতে হবে। কেনার তো ইচ্ছা না। দাম যাচাই করে দেখা যাক কেমন অবস্থায় আছে দেশটা কম্যুনিস্ট শাসনে।

রাতে ফিরে এলাম হোটেলে। আমাদের জন্য খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে সাংহাই করপোরেশনের সদস্যবৃন্দ। সেখানেও বক্তৃতা হলো। ঐ একই বক্তৃতা। এখানে যথেষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তারা অনেকেই বক্তৃতা করলেন। আমাদের পীর সাহেব তার সাধারণ ভঙ্গিতে বক্তৃতা করে সকলকে ধন্যবাদ দিলেন। আমাদের বহু উপহার মিলল। খাওয়ার পরে বেরিয়ে পড়লাম রাতের সাংহাই শহরের অবস্থা দেখতে। অনেক জায়গা ঘুরলাম, তারপর ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে ভাবলাম, চুলটা কাটিয়ে নেই। হোটেলেই সেলুন ছিল। বেচারা সেলুনআলা খুবই ভদ্রলোক, ইংরেজি কিছু বোঝে। আমার সাথে আলাপ করলো। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের নাম শোনে নাই। ভারতবর্ষ জানে। তাকে যখন বুঝাইয়া বললাম তখন সে বললো, শুনেছি ইংরেজ চলে যাওয়ার সময় ভারতকে ভাগ করে দুই দেশ করে দিয়ে গেছে, তার নামটা আমার স্মরণ ছিল না। আমার কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। আমার আবার পরিচয় কী? কী বলতে পারি? বললাম, এমনি ঘুরে বেড়াই, দেশ বিদেশ দেখি। মনে মনে বলি, 'আমার আবার পরিচয়? পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বক্তৃতা করে বেড়াই। আর মাঝে মাঝে সরকারের দয়ায় জেলখানায় পড়ে খোদা ও রসুলের নাম নেবার সুযোগ পাই। এই তো আমার পরিচয়।'

সেলুনআলাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের অবস্থা কী? এখন কেমন আছ? নতুন সরকারের ব্যবহার কেমন? কোনো অত্যাচার করে কি না?" বললো, "ভালো আছি, দেশের অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চুরি ডাকাতি ভিক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে আমার আয় একটু কম হয়েছে। এখন বিদেশ থেকে খুব বেশি লোক আসে না। আগে অনেক দেশের লোক আসতো, টাকা-পয়সা আয় যথেষ্ট হতো। তবে আয় বেশি না হলেও যা আয় হয় তাতে বেশ চলে যায়। কারণ, জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক। আগে হঠাৎ কোনো জিনিসের দাম বেড়ে গিয়ে সকল টাকা বেরিয়ে যেত ঘর থেকে।" এর বেশি কিছু বলতে চায় না, কারণ বোধ হয়, ভয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "নয়া সরকার শহর দখল করবার পরে অত্যাচার করেছে কি না?" বললো, "কিছুটা তো করেছেই–যারা পূর্বে চিয়াং কাইশেকের সাথে হাত মিলাইয়া নিরীহ কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের ওপর।" আমি বললাম, "কর্মী কাদের বলেন?" বললেন, "কেন? যারা গরিবের কথা বলতো, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতো, কালোবাজারির বিরুদ্ধে, আমেরিকার

বাজারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের দাবি দাওয়ার কথা বলতো, তাদের কর্মী বলি।” উত্তরটা একটু কড়াভাবেই বললো। আমি বললাম, “যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী অত্যাচার করেছে তাদের তো আর পায় নাই?”

আমাকে বললো, “বড় বড়গুলি পালাইয়া গেছে, তবে অনেকগুলিকে পাওয়া গেছিল, তাদের জনগণের কোর্টে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে আর কাউকে কাউকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে।”

আমি বললাম, “যারা অন্যায়ভাবে কালোবাজারি করে ব্যবসা করেছে তাদের কী হয়েছে?” বললো, “অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে আর অনেককে বিচার করে জেল দিয়েছে।”

আরও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু উত্তর দিতে চায় না। পট করে আমার দেশের কথা জিজ্ঞাসা করলো। বললাম, “বহু বছর পরাধীন ছিলাম, কয়েক বৎসর হলো স্বাধীন হয়েছি। এখন পর্যন্ত বেশি কিছু করতে পারি নাই, তবে অনেক কিছু করবার পরিকল্পনা হয়েছে। আর সম্ভাবনাও আছে। আশা করা যাইতেছে।”

বেচারা বোধ হয় আমার কথা বুঝতে পারলো না। মাথা নত করে চুপ করে রইল। আমার চুল কাটা হলে যখন বিদায় নিতে চাইলাম, তখন সে আমাকে একটা খাতা বের করে দিয়ে বললো, কেমন চুল কাটলাম লিখে দিয়ে যান। খাতাটা খুলে দেখলাম অনেকেই লিখে দিয়ে গিয়েছেন। অনেক দেশের অনেক নেতা। আমি বললাম, আমার লেখাতে কী হবে, আমি তো নেতা নই। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, যা হোক লিখে দিতে বাধ্য হলাম। রুমে এসে গোসল করে নিলাম, কারণ, আবার বের হতে হবে। মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি দেখতে যাব।

একটু পরেই দেখি, আমার দোভাষী আমাকে এসে খবর দিলেন, “গাড়ি প্রস্তুত, চলুন।” আমি ইলিয়াস ও দোভাষী মিস লী একই গাড়িতে চললাম। ভদ্রমহিলা খুব ভালো ইংরেজি জানেন। এর ইংরেজি পরিষ্কার, সকলেই বুঝতে পারে। অন্য যে সমস্ত দোভাষী আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তারা চীনা কায়দায় ইংরেজি বলে বলিয়া বোঝা অনেক সময় কষ্ট হয়।

আমি মিস লীকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কোথায় লেখাপড়া করেছেন?” তিনি বললেন, “সাংহাইতে আমেরিকার দ্বারা পরিচালিত কয়েকটা স্কুল ছিল, আমি এর এক স্কুলে লেখাপড়া করেছি।” আরও বললেন, “সমস্ত মাস্টারই আমেরিকান ও ইংরেজ ছিল।” মিস লী এখনও লেখাপড়া করেন। আমাদের দেশের মানে বিএ পড়ছেন। আমি বললাম, আমেরিকানরা তো চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, এখন সেখানে কে লেখাপড়া করায়? উত্তর দিলেন, সরকার সমস্ত ভার নিয়েছেন এবং জাতীয়করণ করেছেন। এখন ২/১ টা স্কুল আছে যেখানে শুধু ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয়, আর সব শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে করা হয়। আমি তাকে অনেক প্রশ্ন করলাম, কিন্তু ভদ্রমহিলা শুধু কথা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি কম্যুনিস্ট কি না?” উত্তর দিলেন এক কথায়, “না। তবে যুব সমিতিতে আছি।” আমি বললাম, “ওটা তো কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত।” বললেন, “হ্যাঁ, কিছুটা।”

আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় প্রশ্ন করলাম যে, “নয়া সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে সাংহাইয়ের অবস্থা কী ছিল, এবং এখনই বা কেমন হয়েছে?” এক কথায় উত্তর দিলেন, “এখন অনেক ভালো আছি।”

এখানে একটা বিষয় আলোচনা করা দরকার, চীনা শান্তি কমিটি ও সরকার ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমরা পাকিস্তান থেকে যারা গিয়াছি তারা কম্যুনিস্ট না এবং কম্যুনিস্ট ভাবাপন্নও না। অনেকে এর মধ্যে কম্যুনিস্ট বিরোধীও আছেন। তাই বোধ হয় প্রাণ খুলে আমাদের সাথে আলাপ করছেন না অনেকেই। ইলিয়াসও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে। ২/১টা কথার উত্তর মাঝে মাঝে দিয়েছেন।

আমরা মিউজিয়ামে পৌঁছলাম। অনেক নিদর্শন বস্তু দেখলাম। উল্লেখযোগ্য বেশি কিছু দেখেছিলাম বলে মনে হয় না। তবে অনেক পুরানো কালের স্মৃতি দেখা গেল।

পরে আমরা লাইব্রেরি দেখতে যাই। শুনলাম সাংহাই শহরের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় পাবলিক লাইব্রেরি। খুবই বড় লাইব্রেরি সন্দেহ নাই, ব্যবস্থাও খুব ভালো। রিডিং রুমগুলি ভাগ ভাগ করা রয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যও একটা রুম আছে। সেখানে দেখলাম ছোটদের পড়বার উপযুক্ত বইও আছে বহু, ইংরেজি বইও দেখলাম।

লাইব্রেরির সাথে ছোট একটা মাঠ আছে, সেখানে বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে। মাঠে বসে পড়াশোনা করার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। আমার মনে হলো কলকাতার ইমপেরিয়াল লাইব্রেরির মতোই হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, লাইব্রেরিটা বহু পুরানা। চিয়াং কাইশেক সরকারও এর কিছু উন্নতি করেছিল।

সেখান থেকে আমরা অ্যাকজিবিশন দেখতে যাই। আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। নতুন চীন সরকার কী কী জিনিসপত্র তৈয়ার করেছেন তা দেখান হলো। কত প্রকার ইনস্ট্রুমেন্ট করেছে, তাও দেখালো। আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

এক ঘণ্টা পরে আবার বেরিয়ে পড়লাম সাংহাই শহরের পাশে যে নদী বয়ে গেছে তা দেখবার জন্য। আমাদের দেশের মতোই নৌকা, লঞ্চ চলছে এদিক ওদিক। নৌকা বাদাম দিয়ে চলে। পরে ছেলেদের খেলার মাঠে যাই, দেখি হাজার তিনেক ছেলেমেয়ে খেলা করছে। শিক্ষকরাও তাদের সাথে আছেন। আমাদের যাওয়ার সাথে সাথে কী একটা শব্দ করলো, আর সকল ছেলেমেয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়াইয়া গেল এবং পরে আর একটা শব্দ হওয়ার পরে আমাদের সালাম দিলো, আমরা সালাম গ্রহণ করলাম। তারা স্লোগান আরম্ভ করলো। আমরা বিদায় নিয়ে দলে এলাম।

দোভাষীকে বললাম, "চলুন যেখানে সকলের চেয়ে বড় বাজার, সেখানে নিয়ে চলুন।" সেখানে পৌঁছিয়াই একটা সাইকেলের দোকানে ঢুকলাম। সেখানে চীনের তৈরি সাইকেল ছাড়াও চেকশ্লোভাকিয়ার তৈরি তিন চারটা সাইকেল দেখলাম। তাতে দাম লেখা ছিল। চীনের তৈরি সাইকেল থেকে তার দাম কিছু কম। আমি বললাম, "বিদেশি মাল তা হলে কিছু আছে?" দোকানদার উত্তর দিলো, "আমাদের মালও তারা নেয়।" আমি বললাম, "আপনাদের তৈরি সাইকেল থেকে চেকশ্লোভাকিয়ার সাইকেল সস্তা। জনসাধারণ সস্তা জিনিস রেখে দামি জিনিস কিনবে কেন?"

দোকানি জানায় : আমাদের দেশের জনগণ বিদেশি মাল খুব কম কেনে। দেশি মাল থাকলে বিদেশি মাল কিনতে চায় না, যদি দাম একটু বেশিও দিতে হয়।" সাংহাইয়ের অনেক দোকানদার ইংরেজি বলতে পারে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়তে পারে না, কারণ জনসাধারণ খুব সজাগ হয়ে উঠেছে। যদি কেউ একটু বেশি দাম নেয়, তবে তার আর উপায় নাই! ছেলে বাপকে ধরাইয়া দিয়েছে। স্ত্রী স্বামীকে ধরাইয়া দিয়েছে, এরকম বহু ঘটনা নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে হয়েছে। তাই দোকানদারদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সরকার যদি কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের ধরতে পারে তবে কঠোর হস্তে দমন করে। এরকম অনেক গল্প আমাদের দোভাষী বলেছে। রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। আগামীকাল সকালে আমরা রওয়ানা করবো।

হোটেলে এসে শুনলাম, আমাকে কে বা কারা অনেক খোঁজ করেছেন। আমি ভাবলাম, এদেশে আমায় কে খোঁজ করবে? আরও শুনলাম, তারা চীনদেশীয় লোক। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ব্যাপার কী? খাওয়ার পরে শান্তি কমিটির সভাপতি আমাকে বললেন, "কাল আপনি যে শ্রমিক মেয়েটিকে আংটি উপহার দিয়েছিলেন, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং বহুক্ষণ বসে থেকে আমার কাছে এই কলমটা উপহার দিয়া গেছেন। এই কলমটার নাম 'লিবারেশন পেন।' ক্ষমা চেয়ে গেছেন, কারণ তারা থাকতে পারেন নাই, তাদের বিশেষ কাজ আছে। সকালেও একবার এসে গেছেন।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমাদের দেশে তো এ নিয়ম নাই যে একজন উপহার দিলে তাকে আর একটা উপহার দিতে হয়।" শান্তি কমিটির সভাপতি বললেন, "এটা চীনদেশ। এদেশের নিয়ম, উপহার দিলে সেই মুহূর্তে যিনি উপহার দিলেন তাকে একটা উপহার দিতে হয়। আপনি চীন দেশে এসেছেন, চীনের নিয়মই আপনাকে মানতে হবে।" আমার খুব লজ্জা হলো। আমি আরও বাধা দিলাম, কিন্তু কিছুতেই শুনল না। আমাকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হলো।

যতগুলি উপহার পেয়েছিলাম, তার মধ্যে এইটাই আমার কাছে বেশি মূল্যবান। শ্রমিকের উপহার, দিন মজুরের উপহার, পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে তা

দিয়ে যে উপহার দেওয়া হয় সেটাই সকলের সেরা এবং মূল্যবান। অর্থ মূল্য দেখে উপহারের বিচার করতে হয় না।

আমরা সাংহাই থেকে ট্রেনে হাংচো যাব। আমাদের দোভাষী এবং শান্তি কমিটির প্রতিনিধিরা তুলে দিতে আসলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসেছে আমাদের ফুল উপহার দিতে। চীনের যেখানেই যাই শুধু ফুল আর ফুল। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা। এত ফুলের দেশ এই চীন, কত রকমের ফুলের মালাই না আমাদের দিয়েছিল। এত ফুল কোথায় পায় বুঝতে পারি না। তবে কি কম্যুনিস্ট দেশেও ফুলের আদর হয়! আগে তো জানতাম না।

ট্রেনে খুব ভিড় ছিল না। আমাদের জন্য রিজার্ভ করা হয়েছিল দুইটা কামরা। প্রত্যেক কামরায় চারটা করে সিট, পাশে আর একটা কামরা ছিল যাতে ভারতের কয়েকজন প্রতিনিধিও ছিলেন। ট্রেনেই আমাদের যাবতীয় খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ১৩/১৪ ঘণ্টা ট্রেনে থাকতে হবে। আমাদের সাথে দোভাষী ছিল একটা কলেজের ছেলে। কোনোমতে ইংরেজি বলতে পারে। আর কয়েকজন কর্মচারীও ছিল। একজন বড় অফিসার ছিলেন বলে মনে হলো। কিন্তু সাধারণ পোশাক পরা, চেনা কষ্টকর।

আমাদের সীমান্ত আওয়ামী লীগ নেতা খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোরকে নিয়ে মাঝে মাঝে মসিবত হতো। বেচারা হুঁকা ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে না। আমরা এক কামরায়ই ছিলাম, ঘণ্টায় ঘণ্টায় হুঁকা ধরায় আর এক দুইটা টান দিয়া কাশতে শুরু করে। পূর্ববাংলার লোক এ তামাক খেলে বোধ হয় বেহুঁশ হয়ে পড়বে—এত রাফ। হুঁকাটা ও তামাক তিনি করাচি থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

উড়োজাহাজে বসেও তামাক খেতেন, আবার যখন নামতেন ওটা হাতে নিয়েই নামতেন। যেখানে যেতেন হুঁকাটা হাতে নিয়ে যেতেন। সাদা মনের পাঠান, যা কিছু করে সাদা মনে করে। সোজাভাবে চলে, কেউ কিছু মনে করলো কি না, তাতে সে ভ্রুক্ষেপও করত না। তামাক কমে এসেছিল, একদিন সিগারেট ছিঁড়ে তামাকের পাতার সাথে মিশাইয়া খাওয়া শুরু করলো। কোনো ভাবনা নাই, চিন্তাও নাই। খান সাহেব প্রায় পাঁচ বৎসর সীমান্তে যেতে পারেন না। কারণ, সরকারের হুকুম নাই। তাঁকে কাছুম খানের লীগ সরকার রাজনীতি করার জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন। বহুদিন লাহোরে আছেন। ইংরেজ আমলেও প্রায় ৭ বৎসর জেল খেটেছেন। যাহোক, তার সাথে বহু গল্প করে গান গেয়ে ট্রেনের সময় কাটাতাম। ইলিয়াসের সাথে লুন্দখোরের খুবই খাতির ছিল।

আমরা হ্যাংচো পৌঁছলাম। এখানে আসার আমাদের উদ্দেশ্য হলো কো-অপারেটিভ ফার্মিং দেখব। এই শহরটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সমস্ত চীনের মধ্যে বিখ্যাত একটা স্বাস্থ্যনিবাসও বটে। সত্যই দেখে মুগ্ধ হলাম। একটা বিরাট লেকের চার পার্শ্বে শহরটা। পাশে ছোট ছোট পাহাড়, তার গা ঘেঁষেই

বড় বড় বাড়ি গড়ে ওঠেছে। লেকের গা ঘেঁষেই আমাদের হোটেলটা। হোটেল থেকে জানলা দিয়ে সমস্ত লেকটাকে দেখা যেত।

ছোট ছোট নৌকা বিদেশিদের নিয়ে লেকের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের চেয়ে মধুর হলো যখন চাঁদ উঠল। আমরা রাত্রেই পৌঁছেছিলাম বলে জ্যোৎস্নায় দেখে নিলাম লেকটাকে। এখানেও দোভাষী একটা পাওয়া গেল। রাতে এসেই আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এই এই জায়গার মধ্যে কোনটা কোনটা আপনারা দেখতে যাবেন? আমরা দেখে ওদের মতামত নিয়ে প্রোগ্রাম করে দিলাম।

সকালেই আমাদের কো-অপারেটিভ ফার্মিং দেখতে নিয়ে গেল। এখানে একটা জমিতে পাটের চাষ দেখলাম। পাটগুলি বড় বড় হয়েছে, কিন্তু জানা গেল আঁশ বেশি ভালো হয় না। চেষ্টা চলছে। কৃষকরা যারা কাজ করে তাদের বাস করার জন্য ভালো ভালো ঘর করা হয়েছে। আমাদের জানাল, আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। এখন দেশের লোক এদিকে ঝুঁকে পড়ছে। আমরা আর কয়েকটা জায়গা দেখলাম। বহু দূরে একটা বৌদ্ধ উপাসনাগার দেখতে পেলাম। বহুদিনের পুরানো স্মৃতি। অনেক যত্নে রাখা হয়েছে। হাজার হাজার লোক বৎসরে এখানে উপাসনা করতে আসে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের দেশের লোক কি ধর্মকর্ম করে?" একজন উত্তর করলো, "সকলেই আমরা ধর্ম পালন করে থাকি। আমাদের কেহ বাধা দেয় না। আর নিষেধও করে না, আর নিষেধ করলেই আমরা শুনব কেন? আমাদের সরকার ধর্মকর্ম করতে কাহাকেও বাধা দেয় না।"

আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। লেকের পারে একটা পাহাড় ছিল সেখানে উঠলে সমস্ত শহর ও লেকটা দেখা যায়। পীর সাহেব বললেন, আমরা উঠবো। আমি ও পীর সাহেব সেখানে উঠলাম। আস্তে আস্তে সকলেই উঠলো। একটু কষ্ট করে উঠতে হয়। কিন্তু দেখবার মতো জায়গা। দেখে আনন্দে বুক ভরে গেল। মনে হলো এখানে যদি কিছুকাল থাকতে পারতাম, তবে খুবই আনন্দ হতো।

তারপর নেমেই একটা বসার জায়গা—পাহাড় ও লেকের মাঝখানে। আমরা সেখানে কিছু সময় বসলাম, ওখানে ছোট একটা চায়ের দোকান ছিল। চা খেলাম। দাম যখন দিবার চাইলাম, কিছুতেই গ্রহণ করবে না। সেখানে কয়েকটা দোকানে মাছ বিক্রি করে। খাবার মাছ নয়, শৌখিন মাছ। ছোট ছোট কাচের পাত্রে রঙিন মাছগুলি রাখা হয়েছে। এক এক পাত্রে তিন চার রঙের মাছও রয়েছে। ইচ্ছা হলো কিনি, কিন্তু কিনে কী করবো! কোথায় চীন আর কোথায় পূর্ব বাংলা! নিতে যা খরচ হবে তা আমার দেওয়ার ক্ষমতা নাই। আর ভাড়া দিয়া নেবার মতো টাকাও নাই। রাখার মতো বাড়ি নাই। আর দেখভাল করার মতো লোকও আমার নাই। কারণ সকল জিনিসেরই জন্য টাকার প্রয়োজন। ওইটার অভাবই আমার বেশি।

অনেকক্ষণ গাছের ছায়ায় চেয়ারে বসে লেকের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। পরে রওয়ানা করতে বাধ্য হলাম। কারণ, খেয়েই আমরা নৌকায় বেড়াতে বের হব, সন্ধ্যা পর্যন্ত বেড়াব। আমাদের মধ্যে কয়েকজন নৌকা ভাড়া করে ওখান থেকেই সোজা হোটেলের দিকে রওয়ানা করলো। আমরা মোটরে আরও দু'একটা জায়গা দেখে হোটেলে যাব। বারোটায় আমরা হোটেলে পৌঁছলাম। তাড়াতাড়ি খেয়ে নৌকায় উঠলাম। ছোট্ট ছোট্ট নৌকা, দু'জনে বইঠা বায় দাঁড় টানার মতো করে। মেয়েরাই নৌকা চালায় ওদেশে।

আমাদের জন্য চারখানা নৌকা ঠিক হলো। নৌকার ভিতরে চারজন করে বসতে পারে। মোটর গাড়ির মতো গদি দেওয়া বসবার জায়গা। আমাদের সাথে চা, ফল-ফলাদি কিছু নেওয়া হয়েছিল। নৌকা ছাড়া হলো। আমাদের মধ্যে অনেকে নৌকা বাইবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল। অনেকে চেষ্টা করলো দাঁড় টানতে, হাল ধরতে, কেউই ঠিকমতো নৌকা বাইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, "তোমরা বালুর দেশের লোক, নৌকা বাইবা কী করে? ঘোড়া দাবড়াতে পারো।"

আমার নৌকায় সামনের যে দাঁড় ছিল, প্রথমে আমি দাঁড়টা টানতে শুরু করলাম। কার নৌকা আগে যায় দেখা যাবে! কেউই পারে না, কারণ আমি পাকা মাঝি, বড় বড় নৌকার হাল আমি ধরতে পারি। দাঁড় টানতে, লগি মারতে সবই পারি। পরে আবার হাল ধরলাম। পাকা হালিয়া–যারা আমাদের নৌকার মাঝি তারা তো দেখে অবাক! এ আবার কোন দেশের লোক! এক মাঝি জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের বাড়ি কোন দেশে? দোভাষী সাথে ছিল, বললাম, পূর্বপাকিস্তান। মুখের দিকে চেয়ে রইল। মনে হলো কোনোদিন নামও বোধ হয় শোনে নাই, তাকে বুঝাইয়া বললাম, তারপর সে বুঝল। তাকে বললাম, আমাদের পানির দেশ, বৎসরে ৬ মাস আমরা পানির মধ্যে বাস করি।

মসিবত হলো, ভাষা বোঝে না, কী আর বলবো! চুপ করে রইলাম। এই আনন্দের সময় কি কথা না বুঝলে দোভাষীকে দিয়ে কথা বুঝাইয়া বলা ভালো লাগে? এই লেকের ঠিক মধ্যখানে একটা দ্বীপ আছে। সেখানে দোকান আছে। একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে। আর বসবার ভালো ভালো জায়গা আছে। একটা চায়ের দোকানও আছে। বহু বড় বড় গাছ রয়েছে। এই দ্বীপের মাঝখানে আবার একটা পুকুরের মতো আছে। তার ওপর দিয়া পুল দেওয়া আছে। মাঝে মাঝে মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এত বড় লেকের ভিতর ছোট্ট একটা দ্বীপ; সেখানে চায়ের দোকান, বসবার ব্যবস্থা, বুঝতেই পারেন কী সুন্দর জায়গাটা। কত ভালো লাগে!

আমাদের যে পাষাণ হৃদয়–যার সাথে সম্বন্ধ নিভৃত কারাগার আর তার পাথরের মতো শক্ত দেওয়ালগুলির। মাঝে মাঝে বাইরে থাকলে পুলিশের লাঠিচার্জ, 'জাতীয় সরকারের' চোখ রাঙানো–সেই আমাদের জীবনেও আনন্দের সঞ্চার হয় এখানে আসলে। অনেকক্ষণ বসে গল্প করলাম। অনেক ইতিহাস এই

জায়গার শুনলাম। শুনেছি কাশ্মীরের শ্রীনগরে নাকি এমনি লেক আছে। তবে কিছুটা আঁচ করতে পারেন, যদি আজমীর শহরের আনার সাগরে যেয়ে থাকেন। কিন্তু হাংচো'র এই লেকের সাথে এদের কোনো তুলনা হয় না। আমরা নৌকায় উঠলাম, চললো সামনের দিকে, সেখানে মোটর আসবে। আমরা ওখান থেকেই কিছু জিনিস কিনতে বাজারে যাব।

লেকের ভিতর একটা বড় নৌকায় প্রায় ১০/১২ জন ছাত্রছাত্রী নৌকা বেয়ে ফুর্তি করছে। আমাদের নৌকা কাছাকাছি আসলেই বুকের শান্তি সম্মেলনের ব্যাজ দেখেই 'গোপীং ওয়াংসে' স্লোগান দেওয়া শুরু করলো। আমরাও উত্তর দিলাম।

আমাদের নৌকার কাছে এসে বললো, আপনারা আমাদের নৌকায় কয়েকজন আসুন। কেউই যেতে চায় না বলে আমিই ওদের নৌকায় উঠে পড়লাম। অনেকে গেল না, কারণ সাঁতার জানে না, ভয়ে এমনিতেই জড়সড়ো। আমার তো সাঁতার কিছুটা জানা আছে। ২/১ মাইল আস্তে আস্তে সাঁতারাইয়া যাওয়ার অভ্যাসও ছোটকালে ছিল। ওদের নৌকায় উঠে দেখি ছাত্রছাত্রীরা কেউ নৌকা এদিক টান দেয় কেউ ওদিক টান দেয়, আর মাঝি যে ছাত্রটা হয়েছিল সে তো মাঝে মাঝে নৌকা ঘুরাইয়া দেয়। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কোথায় পড়েন? বললো, আমরা ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। এখানে ছুটি উপভোগ করতে এসেছি। আমাদের নৌকাগুলি সব এগিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আমি বললাম, আমার কাছে বইঠা দেন। আমি ভালো নৌকা বাইতে পারি। বইঠা দিলে বাওয়া শুরু করলাম। বেচারারা দেখে তো হতবাক! অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কী করেন? আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি আছে কি না? তাদের লোক ভালোবাসে কি না!

আমি বললাম যে, আমি রাজনীতি করি। তবে কম্যুনিস্ট না। আমাদের আলাদা পার্টি আছে। তার ভিন্ন প্রোগ্রাম আছে। কম্যুনিস্ট পার্টিও একটা আছে। তবে তার জনসমর্থন বেশি নাই। আমাদের দেশের লোকেরা কম্যুনিস্টদের কথা শুনলে কিছুটা ভয় পায়।

ছাত্রছাত্রীগুলি একটু আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আরও অনেক বিষয়ে আলাপ হলো। আমাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করলো। পরে প্রত্যেকেই একটা ছোট্ট খাতা বের করলো, প্রত্যেকেই আমার নাম ও ঠিকানা লিখে দিতে বললো। আমি পাড়ে বসে ওদের খাতাগুলি নিয়ে ইংরেজিতে সই করে দিলাম। কারণ, ওখানে বাংলা জানা লোক নাই বললেই চলে।

দেখি পীর সাহেব আমার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, মনে মনে একটু রাগও হয়েছেন, কারণ দেরি হয়ে যাচ্ছিল। আমরা সন্ধ্যায় বাজারে এলাম। ওখানে হাতে তৈরি একপ্রকার পাখা পাওয়া যায়। হাড়ের, বাঁশের, নানা প্রকারের। দামও খুব বেশি না। তবে যারা কলকাতা বা বড় বড় শহরে খানদানি ইংরেজ বড়লোকদের বাড়ি গিয়াছেন তারা বোধ হয় দেখে থাকবেন। পাখাগুলি ভেঙে হাতের মধ্যে রাখা যায়। আবার টান দিয়ে খুলে বাতাস নেওয়া যায়। আমাকে

একটা ওরা উপহার দিয়াছিল, আর একটা আমি কিনে এনেছিলাম। একটা উপহার দিয়াছিলাম আমার এক বড় ভাই বন্ধু যা বলেন তার স্ত্রীকে, আর একটা উপহার দিয়াছিলাম আমার একমাত্র সহধর্মিণীকে। যাদের কাছে টাকা ছিল বেশি তারা অনেক কিছু কিনল।

সন্ধ্যার পরে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। আমাদের জন্য হ্যাংচো শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে খাওয়ার আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। আমার পাশে যিনি খাওয়ার জন্য বসেছিলেন তিনি একজন বড় সরকারি কর্মচারী হবেন। ইংরেজি জানেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, আমাদের জন্য যে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি মুসলমান বাবুর্চি দ্বারা পাক করানো হয়েছে। কর্মচারী বললেন, "আমরা মুসলমান বাবুর্চি জোগাড় করেছি কারণ, আপনারা মুসলমান। যে যে জিনিস আপনাদের খেতে নিষেধ আছে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা কী করে জানেন কী কী জিনিস আমরা খাই না?" তিনি বললেন, "কেন? আমাদের দেশের মুসলমানরা অনেক জিনিস খায় না। আমরা পাশাপাশি যুগ যুগ ধরে বাস করছি। আমরা জানি মুসলমানদের কোনো কোনো জিনিস খাওয়া নিষেধ। আমাদের কোনো কোনো জিনিস নিষেধ তাহা মুসলমানরাও জানে।" ওদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করা হলো। আর আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হলো। পীর সাহেব বক্তৃতা করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

আবার হোটেলে এসেও আমরা গল্পে বসলাম—হ্যাংচো'র কয়েকজন ভদ্রলোক, আমি, ইলিয়াস ও দোভাষী। জানালায় দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দেখে নিতাম লেকের সৌন্দর্য। চাঁদের আলোয় রাতে সকল কিছুই দেখা যায়; ছোট ছোট নৌকা ঘুরে বেড়াচ্ছে লেকের ভিতরে। অনেকক্ষণ গল্প করার পরে দোভাষী ও অন্যরা বিদায় নিলো। আমরাও তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

কাল সকালে আমরা রওয়ানা করবো দেশের দিকে। হংকং-এ একদিন থাকবো। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে ট্রেনে চড়ে রওয়ানা করলাম। ক্যান্টন হয়ে যাব, কিন্তু নামবো না। সোজা আমরা নয়াচীনের বর্ডারে এসে পৌঁছলাম। আমাদের ছোট একটা পুল পার হয়ে ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে ফিরতে হবে, সেখানেও ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে আমাদের হংকং-এ আসতে হবে। ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে নয়াচীনের কর্মচারীদের ভাবটা ভালোই দেখলাম। উভয়ে উভয়কেই সম্মান ও খাতির করে। ইংরেজ জাত জানে কী করে পরের দেশে রাজত্ব করতে হয়। কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে না। জানে কম্যুনিস্ট চীন তাদের বন্ধু না, তবু বন্ধুভাবে তাদের গ্রহণ করে। এদিকেও দেখলাম নয়াচীনের কর্মচারীবৃন্দ ইংরেজদের খুবই খাতির করে—তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে না। মিছামিছি চীনের লোকদের হয়রান করে না। ভালো ব্যবহার করেই উভয়ে উভয়ের মন জয় করতে ব্যস্ত।

আমাদের সাথে অনেক মালপত্র ছিল–যা আমরা উপহার পেয়েছিলাম। ইংরেজের কাস্টমস সেগুলি নিয়ে বেশি হৈচৈ করলো না। যখনই শুনল, এগুলি উপহার, তখনই বললো, "যেতে দেও।"

আমরা গাড়িতে এলাম। নয়াচীনের কর্মচারী ও শান্তি কমিটির সভ্যবৃন্দ আমাদের বিদায় সংবর্ধনা জানাল। অনেকে আমাদের সাথে বুক মিলাল। আমাদের যে দোভাষী পিকিং থেকে এসেছিল, সে আমাকে ধরে বললো, "কবে আর দেখা হয়–যদি আমি অথবা আমার দেশের কোনো লোক তোমাদের ওপর কোনো অন্যায় ব্যবহার করে থাকে ক্ষমা করিও। তোমাদের দেশের লোকদের বলিও আমরা ভালো আছি। আমেরিকার মিথ্যা প্রোপাগান্ডা যেন বিশ্বাস করে না। অনেক কষ্ট দিলাম। তোমাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে, তাতে দুঃখ করো না। আমাদের নতুন দেশ এখনও গড়ে তুলতে পারি নাই। আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছি দেশ গড়ার কাজে।" বারবার বললো, "আমাদের ক্ষমা করিও।"

আমি তার কাছ থেকে এবং সকলের কাছ থেকে এক এক করে বিদায় নিয়া রওয়ানা করলাম। যতদূর দেখা গেল, আমাদের হাত তুলে অভিবাদন জানালো। তাদের ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগলো। অনেক ভাবলাম–কবে আর আসি সুযোগ জীবনে নাও আসতে পারে! তবু মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করলাম, এ কথা বলে, "খোদা তুমি এদের মঙ্গল করিও। এরা যেন এদের দেশকে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আর আমাদের দেশকেও যেন আমার সোনার দেশে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের জনগণও যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। পাশাপাশি দু'টা রাষ্ট্র যেন যার যার আদর্শ নিয়া গড়ে ওঠে।"

নয়াচীনে আমি কী কী দেখলাম তার আলোচনা করার চেষ্টা করবো–তাদের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, বেকার সমস্যা দূর করা, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ, উন্নয়ন কাজ যা যা ওরা তিন বৎসরে করেছে।

দীর্ঘ পঁচিশ দিন পর্যন্ত নয়াচীনের কত নগর, কত গ্রাম আমি দেখেছি তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। মহল্লায় মহল্লায় ঘুরেছি। পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়েছি, স্টেশনে স্টেশনে নেমে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। চেষ্টা করেছি দেখতে ভিক্ষুক পাওয়া যায় কি না। এদেশ একদিন ভিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। চার বৎসর আগে এমনি দিনে কেউ রাস্তায় বেরোলে ভিক্ষুক এসে দাঁড়াতো, "বাবা ভিক্ষা দাও, না খেয়ে আছি। আল্লাহ তোমার ভালো করবে।" সে ভিক্ষুক কোথায় গেল? খুঁজতে লাগলাম।

হংকং থেকে ট্রেনে ক্যান্টনসহ বহু স্টেশন পার হতে হয়েছে। পিকিং থেকে হংকং পর্যন্ত পথে হাজার হাজার মাইল ট্রেনে রয়েছি। নানকিং, সাংহাই, ক্যান্টন, হাংচো, সিয়ানকিং সহ বড় বড় শহর ঘুরেছি। একাকী রাস্তায় বেরিয়ে

পড়েছি। রিকশা নিয়ে ঘুরেছি, ভিক্ষুক দেখতে হবে। এরা নিশ্চয় আমাদের কাছ থেকে গোপন করছে যে তাদের দেশে ভিক্ষুক নাই। যখন চেষ্টা করেও একটা ভিক্ষুকের দেখা পাই নাই তখন অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভিক্ষুক দেখতে পাই না কেন? তারা আমাকে বললো, নয়া সরকার কায়েম হওয়ার পরে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, আইন করে? তারা উত্তর করলো, "না। সরকার প্রত্যেক বড় বড় শহরে এবং জেলায় জেলায় ভিক্ষুকদের জন্য 'হোম' করেছে।" যাকে এক কথায় 'ওয়ার্ক হাউস' বলা হয়। সমস্ত ভিক্ষুককে ধরে সেই ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের কাজ দেওয়া হয়, কাজ করে খায়। বিনা কাজে খেতে পায় না। আর যাদের কাজ করার ক্ষমতা নাই যেমন অন্ধ, আতুর তাদের সরকারের পক্ষ থেকে খাবার দেওয়া হয়। অনেককে এর মধ্যে কাজ দেওয়া হয়েছে—যাদের কাজ করার ক্ষমতা আছে। তারা একথাও স্বীকার করলো এখনও গ্রামে ২/১ জন ভিক্ষুক আছে। তাদের খুঁজে পাওয়া যায় নাই। তবে প্রকাশ্যে ভিক্ষা করতে পারে না, লোকে ধরে সরকারি 'ওয়ার্ক হাউসে' পাঠিয়ে দেয়।

ভিক্ষুক সমস্যা নিয়ে যখন ভাবছি তখন আমার মনে পড়লো জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা। ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ার পরে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ভার দেওয়া হলো সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের। যখন তিনি ভার নিলেন তখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারি আরম্ভ হয়ে গেছে। তিনি এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে লোকদের বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন। সমস্ত জনগণের কাছে সাহায্য ও সহানুভূতি চাইলেন। তখন ইংরেজ সরকার আমাদের রাজা ছিল। যুদ্ধের জন্য সকল কিছুই ইংরেজের হাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী তখন প্রত্যেক মহকুমায় এবং এমন কি এক মহকুমায় দুই তিনটি করে 'ওয়ার্ক হাউস' করার হুকুম দিলেন এবং সেই সমস্ত এলাকার যেসব লোক ভিক্ষা করে কোনো রকমে জীবন বাঁচাইয়া রেখেছিল এবং বেকার হয়ে পড়েছিল তাদের 'ওয়ার্ক হাউসে' নিয়ে কাজ দেওয়া হলো এবং খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সমস্ত লোক কেউ সুতা কাটতো, কেউ কাপড় বুনতো, কেউ বেতের চেয়ার করতো, এমনি ধরনের নানাপ্রকার কাজ করতো। দুই বৎসর পরে আবার হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছিল, যে সমস্ত লোক সেখানে থাকতো, খেতো ও কাজ করতো, তাদের খাওয়া থাকার খরচ এবং কর্মচারীদের বেতন দিয়েও সরকারের কিছু কিছু আয় হতো। এতে দেখা যায় যে প্রথমে ২/১ বৎসর সরকারের লোকসান হলেও পরে সরকারের আয় হয়। লোকসান হয় বলে আমি মনে করি না, কারণ সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তা জনগণকে বাঁচাবার জন্য এবং জনগণেরই দেওয়া এই টাকা। নয়াচীনে এ কথা শুনে আমার বিশ্বাস হলো যে 'ওয়ার্ক হাউস' করে তারা ভিক্ষাবৃত্তি প্রায় বন্ধ করে দিয়াছে। তাই চীনের যথেষ্ট জায়গা খুঁজেও একটা ভিক্ষুক দেখতে পেলাম না।

তবে একথা সত্য যে, এখনও চীনের লোক খুবই গরিব। কোনোমতে কাজ করে ভাত খাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। সাধারণ লোককে আমি ময়লা, ছেঁড়া, তালি দেওয়া কাপড় পরতে দেখেছি। অধিকাংশই এই ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে। এখন পর্যন্ত নয়াচীনের জনগণের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু সেটা দেখেই বোঝা গেল।

আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, এই জাতটা আফিমখোরের জাত। দুনিয়ায় আফিমখোর বললে এক কথায় চীনের লোককে বোঝা যায়। আমি যখন কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তাম তখন মাঝে মাঝে আমার বন্ধু মি. জহিরুদ্দিনের (যিনি এখন ঢাকায় উকিল) বাড়ি যেতাম। যাবার সময় পথে চীনা পাড়া পার হয়ে যেতে হতো। নাকে কাপড় না দিয়ে যাওয়া যেত না; হয় মদের গন্ধ না হয় অন্য কিছুর দুর্গন্ধ।

চীনে যেয়ে আফিম খাওয়ার নেশাটার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম–ব্যাপার কী? সরকারের হুকুম, আফিম খাওয়া চলবে না। আর কার সাধ্য, আফিম খায়! আমার মনে হয় অত্যাচার করেই আফিম খাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। যদি সরকার খবর জানতে পারে যে, কোনো লোক আফিম খায় তা হলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। সরকারের খবর পেতে কষ্ট হয় না। জনসাধারণই সরকারকে গোপনে খবর দেয়। এমন শোনা গেছে যে, স্বামী আফিম খাওয়া ছাড়তে চায় না, তাই স্ত্রী সরকারকে খবর দিয়াছে যে, আমার স্বামী আফিম খায় এবং খাওয়া ছাড়তে চায় না। ছেলেমেয়ে বাবা-মার বিরুদ্ধে সরকারকে খবর দিয়াছে। এমন অনেক গল্প আমি শুনলাম। তবে একথা সত্য যে, আফিম খাওয়া একবারে বন্ধ হয়েছে কি না বলতে পারি না। তবে শতকরা ৮০ জন লোক যে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এখনও আফিম খাওয়ার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছে। আমাকে একজন দোভাষী বলেছে, "পালাইয়া পালাইয়া এখনও ২/১ জনে খায়, তবে দুই তিন বৎসরের মধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।"

আমাকে আরও বললো, "বোঝেন তো, যুগ যুগ ধরে এই অভ্যাস চলে এসেছিল আমাদের দেশে। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের আফিম দিয়ে ঘুম পাড়াইয়া এই সোনার দেশটাকে শোষণ ও শাসন করেছে। আর এই বিদেশিরা আফিম ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা অর্থ উপার্জন করে নিয়া গিয়াছে। আর আমাদের দেশের গরিব সর্বস্ব বিক্রি করে শুধু আফিম খেয়েছে। আমাদের সরকার ও আমাদের শিক্ষিত সমাজের প্রতিজ্ঞা, একজনও আফিমখোর রাখবো না এই দেশে।"

আর একটা জিনিসের জন্য চীন বিখ্যাত ছিল, সে হলো ডাকাতি। বিরাট বিরাট দল ছিল ডাকাতদের। চিয়াং কাইশেকের সময় দিনে দুপুরে এরা ডাকাতি, খুনখারাবি করতো, কিছুতেই এদের দমন করতে পারে নাই। আমরাও অনেক গল্প শুনেছি এই ডাকাতির। কেমন করে মানুষ ধরে নিয়ে যেত, টাকা দিলে ছেড়ে দিত। এক

কথায় বলা যেত, 'মগের মুল্লুক।' কিন্তু নূতন সরকার কায়েম হওয়ার পরে কড়া হাতে এদের দমন করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে দল বেঁধে ডাকাত ধরা শুরু হয়েছে। আর সরকার খুব তৎপর হয়ে গ্রামের লোকদের সাহায্য করছে, আস্তে আস্তে ডাকাতি অনেক কমে গেছে। এখনও মাঝে মাঝে ডাকাতি হয়, তবে খুব কম। এক কথায় জনগণ সাহায্য করলে সকল কিছু করাই সম্ভব। শুধু জুলুম ও আইন করে এই সমস্ত অন্যায় কাজ বন্ধ করা যায় না, এর সাথে সুষ্ঠু কর্মপন্থারও প্রয়োজন। চীন সরকার সেই দিকে নজর দিয়েছে বলে মনে হলো। এই সমস্ত ডাকাতি, চুরি, খুনের প্রধান কারণ হলো বেকার সমস্যা। আপনারা জানেন, ৬০ কোটি লোকের এই দেশে কোটি কোটি লোক বেকার ছিল। তাদের না ছিল জমি, না ছিল চাকরি, না ছিল কাজ। তাই তারা কী করে খাবে?

এই সমস্ত কাজ কিছু লোক করে অভ্যাসের দোষে। আর কিছু লোক করতে বাধ্য হয় অভাবের তাড়নায়। পেটে খাবার না থাকলে, ছেলেমেয়ে সামনে না খেয়ে মরলে, রোগে ঔষধের বন্দোবস্ত করতে না পারলে মানুষ অনেক সময় বাধ্য হয় চুরি করতে, ডাকাতি করতে এবং ছলে বলে কৌশলে অর্থ উপার্জন করে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে। তাই নয়াচীন সরকার প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করলো কী করে বেকার সমস্যা দূর করা যায়। বেকার সমস্যা দূর করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার।

চিয়াং কাইশেকের আমলে জমির মালিক জমিদারই ছিল। চাষির জমির ওপর কোনো অধিকার ছিল না। চাষিরা ক্ষেতমজুরি করে কোনো মতে জীবনযাপন করতো। চাষের সময় কাজ পেত অনেকে, আবার বহু লোক পেতও না। আয় খুব কম ছিল। জমিদাররা ইচ্ছামতো কৃষকদের জমি দিত, আবার ইচ্ছা হলে কেড়ে নিত। আইন ছিল বড়লোকদের হাতে।

চাষিরা জমির অধিকার চাইলে তাদের গুলি খেয়ে মরতে হতো। ভাগচাষি নামে এক প্রকার প্রজা ছিল, যা আমাদের দেশেও আছে। তবে আমাদের দেশের জমিদাররা যে অত্যাচার করে, তার চেয়ে সহস্র গুণ অত্যাচার করতো চীনের জমিদাররা। আমাদের দেশে দেখা যায় কোনো কোনো প্রজার ৩/৪ বৎসরের খাজনা বাকি আছে, তবুও জমিদাররা অনেক সময় মামলা করে উৎখাত করে না। আজও দেখা যায় আমাদের দেশের জমিদাররা মাঝে মাঝে প্রজার ওপর অত্যাচার করে থাকে।

চীনের অবস্থা আরও ভয়াবহ ছিল। কারণ 'আইন' বলে কোনো জিনিস ছিল না। আইন জমিদারদের হাতে, তারা ইচ্ছা করলে প্রজাদের ধরে এনে বেত মারতো, না খাওয়াইয়া আটকাইয়া রাখতো। আমাদের দেশেও পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল। যদি কোনো কৃষকের মেয়ে দেখতে ভালো হতো, তবে তো আর উপায় ছিল না। জমিদারের হুকুম তাকে জমিদারের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হবে, খাজনার পরিবর্তে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার ওপর জমিদার অথবা

তার ছেলেরা পাশবিক অত্যাচার করবে এবং কামভাব চরিতার্থ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তার জমিদার বাড়িতে থাকতে হবে ঐ একই ভাবে। যদি কোনো মেয়ের বাবা-মা আপত্তি করে তবে তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হবে এবং অমানুষিক অত্যাচার করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে।

এই সমস্ত জমিদাররা কোনো কাজ করতো না। বড় বড় শহরে এদের ভালো ভালো বাড়ি থাকতো, সেখানে আরামে মদ ও মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা হতো। জমিদাররা অনেক জমি ফেলে রাখতো, কারণ তাদের খাস জমি চাষাবাদ হতো না। এইভাবে কোটি কোটি বিঘা জমি পড়ে থাকতো অনাবাদি হয়ে।

আর একদিকে কোটি কোটি লোক কাজের অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতো। কেউ চুরি ডাকাতি করতো আর কেউ না খেয়ে শৃগাল কুকুরের মতো রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকতো। এমনও অনেক শোনা গেছে যে পেটের দায়ে বাবা মা মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা করিয়ে কোনোমতে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতো।

বছরে বছরে দুর্ভিক্ষ হতো। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বলতে কিছুই ছিল না। কারণ যা উপার্জন করতো তার চেয়ে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি, তাই তা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ তখন পরিবর্তন চায়। কারণ চীনের মানুষ কম্যুনিস্ট পার্টিকে ভালোবাসতো না। তাদের কথা শুনলে ভয়ে শিহরিয়া উঠতো। কিন্তু যখন মানুষের আর কোনো উপায় থাকে না, বিচারের আশা আর করতে পারে না, ইনসাফ দেশের থেকে উঠে যায় তখন মানুষ যাহা সম্মুখে পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরে। চীনের জনগণই তার প্রধান প্রমাণ।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য যখন বেআইনি কম্যুনিস্ট পার্টি আবেদন জানালো, তখন মানুষ তার দিকে ছুটে চললো। আর একটা কারণ, চিয়াং কাইশেক তার দেশে বিরোধী দল গঠন করতে দেয় নাই। যারাই তার বিরুদ্ধে অথবা তার সরকারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতো তখনই তাদের জেল-জুলুম, ফাঁসি, গুলি, নানা রকমের অত্যাচার সহ্য করতে হতো। অনেকে রাজনীতি ছেড়ে ছিল, আর অনেকে বাধ্য হয়ে কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে আশ্রয় নিয়া চিয়াং কাইশেকের অত্যাচার ও অবিচার খতম করার জন্য সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করলো। এই অত্যাচারের বিরদ্ধে যখন কম্যুনিস্ট পার্টি যুদ্ধ ঘোষণা করলো, তখন চিয়াং সরকার সাধারণ মানুষের কোনো সমর্থন তো পেলোই না, উল্টা চিয়াং কাইশেক যাতে পরাজিত হয়, তার জন্য তারা চেষ্টা করতে শুরু করলো।

নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে তারা প্রথম কাজ শুরু করলেন, 'লাঙল যার জমি তার' এই প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে। বড় বড় জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে গরিব জমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন করে দিলো। সত্যিকারের কৃষক জমির মালিক হলো। যে সমস্ত অনাবাদি খাস জমি পড়ে ছিল, তাও ভাগ করে দিলো কৃষকদের

মধ্যে। হাজার হাজার বেকার কৃষক জমি পেল। যখন তারা বুঝতে পারলো জমির মালিক তারা, তাদের পরিশ্রমের ফল জমিদাররা আর ফাঁকি দিয়া নিতে পারবে না, তখন তারা পুরা উদ্যমে চাষাবাদ শুরু করলো। তবে একথা সত্য যে, নতুন চীন সরকার সকলকে সমান করে দেয় নাই, যা আমরা কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে শুনি। এখনও অনেক বড় চাষি জমির মালিক আছে, তারা লোক রেখে চাষাবাদ করে। তবে প্রয়োজনের অধিক যে জমি ছিল তা বাজেয়াপ্ত করে গরিব চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

নয়াচীনে একখণ্ড জমি দেখলাম না, যা অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। রেল লাইনের পাশে যে গর্তগুলি পড়ে থাকে সেগুলিতেও ফসল করা হয়েছে। যদি কোনো জমি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে থাকে তাহলে সরকার কঠোর শাস্তি দেয়। জমি যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; স্বামী জমি যাহা পাবে, স্ত্রীও সমপরিমাণ জমি পাবে এবং দুজনকেই পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, দুজনই জমির মালিক। স্বামী কাজ করবে আর স্ত্রী বসে খাবে এ প্রথা চীনের থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি ট্রেন থেকে পুরুষ ও মেয়েলোক অনেককেই হালচাষ করতে দেখেছি। মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। জমির ট্যাক্স হিসাবে চাষিরা সরকারকে টাকা দিতেও পারে এবং ফসলের এক অংশও দিতে পারে। ট্যাক্স যে খুব কম তা নয়। আমার মনে হলো একটু বেশি।

কৃষক যে জিনিস উৎপাদন করে তার দাম আমাদের দেশের মতো কম হতে পারে না। আমাদের দেশে যখন ধান পাট চাষির ঘরে থাকে, তখন দাম অল্প হয়। যখন মহাজনদের ঘরে থাকে তখন দাম বাড়তে থাকে। চাষি উৎপাদন খরচও পায় না। আর অন্যান্য জিনিস যা কৃষকের কিনতে হয়, যেমন নুন, তেল, কাপড়, এগুলির দাম এত বেশি থাকে আমাদের দেশে, যে কৃষক যা উৎপাদন করে তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। কিন্তু নয়াচীনে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছে, কৃষক যা বিক্রি করে তার দাম দিয়ে ভালোভাবে অল্প দামে তেল, নুন, কাপড় কিনতে পারে। এতে তাদের জমির ফসলের দাম দিয়েই সংসার চালানো সহজ হয়েছে। গরিবদের পাঁচ টাকায় এক মন পাট বিক্রি করে ৪ টাকায় এক সের ডাল তেল কিনতে হয় না তাদের দেশে। প্রত্যেক এলাকাতে সরকারি দোকান আছে সেখানে সস্তায় সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। কোনো দোকানদার ইচ্ছা করলেই বেশি দাম নিতে পারে না। কারণ যদি লোকে জানতে পায় যে কোনো দোকানদার বেশি দাম নিচ্ছে তখন তারা সরকারি কর্মচারীদের খবর দিয়ে নিজেরাই ধরাইয়া দেয় এবং মিটিং করে ঠিক করে ঐ দোকানদারের দোকানে কেউই জিনিসপত্র কিনতে পারবে না। এতে চাষিদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। দেশের ভিতর গণজাগরণ এসেছে বলে এটা সম্ভবপর হয়েছে।

এক জায়গায় এক ঘটনা শুনলাম, এক সরকারি কর্মচারী ঘুষ খেয়েছিল, তাকে জনসাধারণ ধরাইয়া দেয়। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। সেই হতে কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। কেউই ঘুষ খেতে সাহস পায় না।

এইভাবে চাষিদের জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে : যে চাষি সকলের চেয়ে বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্রামে গ্রামে 'মিউচুয়াল এইড সোসাইটি' গড়ে উঠেছে। একে অন্যকে সাহায্য করে। গ্রামের গরিব চাষিরা এক হয়ে তাদের চাষাবাদ করে। এতে সকলের মধ্যে একতা গড়ে উঠেছে। 'প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য, সকলেই সকলের জন্য'–এই নীতির প্রচার খুব হয়েছে এবং কাজও সেইভাবে হতেছে। গ্রামের গরিব চাষিরা একতাবদ্ধ হয়ে চাষাবাদ করাতে মানুষের মধ্যে বিভেদ ভাব দিন দিন দূর হয়ে যেতেছে।

চাষিদের মধ্যে জমি বণ্টন হওয়ায় যথেষ্ট লোক কাজ পেয়েছে। বেকারের সংখ্যাও দিন দিন কম হয়ে যেতেছে। চীন বহু বড় দেশ, সমস্ত দেশটায় চাষাবাদ হতে পারে। সরকার জনগণের সাহায্য নিয়ে হাজামজা নদী, খাল কাটতে শুরু করেছে। প্রত্যেক বৎসর বন্যায় লক্ষ একর জমির ফসল পূর্বে নষ্ট হয়ে যেত; আজ আর সাধারণ বর্ষায় ফসল নষ্ট হতে পারে না। একমাত্র হোয়াংহো নদীতে বন্যায় বৎসরে লক্ষ লক্ষ একর ফসল নষ্ট হতো। সরকার হোয়াংহো নদীতে বাঁধ বাঁধবে বলে জনগণকে ডাক দিলো। লক্ষ লক্ষ লোক পেটে খেয়ে সরকারকে সাহায্য করলো। হোয়াংহোকে বলা হয় চীনের দুঃখ। চীনারা আগে কোনোদিন এই বাঁধ বেঁধে রাখতে পারে নাই। কিন্তু বিপ্লবের পর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়তায় চীনারা অসাধ্য সাধন করেছে। এখন আর হোয়াংহো নদীতে বন্যা হতে পারে না। লোকের এখন আর চিন্তা করতে হয় না। আরামে বৎসরের পর তাদের পরিশ্রমের ফল তারা পায়।

চীনের সরকারের কাজের একটা কায়দা আছে। তারা সকল কাজেই জনগণের সাহায্য চায়। জনগণ বুঝতে পারে এ কাজ তাদেরই মঙ্গলের জন্য, তাই সরকার যখনই ডাক দেয়, লক্ষ লক্ষ লোক তাতে সাড়া দেয়। এক জায়গায় শুনলাম, সরকার ডাক দিলো–'একশত মাইল একটা রাস্তা করতে হবে। তোমাদের যথেষ্ট অসুবিধা হতেছে; সরকারের অত টাকা নাই, তাই তোমাদের নিজেদের কাজ নিজেদের করাই উচিত। প্রত্যেকের আসতে হবে, অন্তত ২ দিন কাজ করে দিতে হবে।' সমস্ত লোক এসে কাজ শুরু করলো, সরকার তাদের খাবার দিলো। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ১ মাসের ভিতর সমস্ত রাস্তা করে দিলো। এইভাবে নয়াচীনে হাজার হাজার গঠনমূলক কাজ জনসাধারণ করেছে, কারণ জনসাধারণের আস্থা আছে সরকারের ওপরে এবং মনে করে এ কাজ তাদের নিজেদের। এমন বহু ছোট বড় কাজ এই তিন বৎসরে চীন সরকার করেছে। একদিন যে চীনের দুনিয়ার কাছে খাদ্য ভিক্ষার জন্য হাত পেতে বসে

থাকতে হতো, খাদ্যের অভাবে কোটি কোটি লোক মারা যেত, আজ সেই চীন বৎসরের খোরাক উৎপাদন করেও জনসাধারণকে আছুদামাফিক অর্থাৎ তৃপ্তি সহকারে মনের সাধ মিটিয়ে খাওয়াইয়া বিদেশে বহু খাদ্যশস্য চালান দেয়। দরকার হলে অন্য দেশকে বিপদের সময় সাহায্য করে। এর অর্থ, নয়া সরকার সৎ ও দেশপ্রেমিক এবং তাদের কাজ গঠনমূলক।

আমাকে এক সরকারি কর্মচারী বলেছেন, যদি কোনো লোক না খেয়ে কষ্ট পায় অথবা ঔষধের অভাব হয়, তাহলে সেই সমস্ত জায়গার সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা এবং কাজের, খাওয়ার ও ঔষধের বন্দোবস্ত করা। যদি শোনা যায় যে, কোনো এলাকায় কোনো লোক না খেয়ে মারা গেছে, তবে সেই এলাকার সরকারি কর্মচারীদের কৈফিয়ত দিতে হয়। সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা চালু করা তাদের কাজ। ঐ সমস্ত এলাকায় কেউ অন্যায় করলে তার বিচার করা, সালিশি করে মিটিয়ে দেওয়া পঞ্চায়েতের কাজ। রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষার দিকে নজর দেওয়াও এই পঞ্চায়েতের কাজ। এই পঞ্চায়েত কমিটির সভ্যদের ইলেকশনে মেম্বার হতে হয়। ছোটখাট বিচার এরাই করে। তবে বিশেষ ধরনের অন্যায় করলে পিপল্‌স্ কোর্টে বিচার হয়। আসামির উকিল রাখতে হয় না। সরকার পক্ষ থেকে উকিল দেওয়া হয়। লোকাল ইনকোয়ারির পরে বিচার হয়। মিথ্যা মামলা অথবা মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করতে হয় না।

যে দেশে সরকারের কর্মচারীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় ও সেরকম সাক্ষ্য দিতে লোকদের বাধ্য করে তাদের ওপর মানুষের আস্থা থাকবে কী করে? ভয় করতে পারে, কিন্তু সে সরকারকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পায় না। এইভাবে গ্রামের কৃষকদের মামলায় আসামি হয়ে জমি বন্ধক দিয়ে, মহাজনদের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে মামলা চালাতে হয় না। কোনো কৃষকের জমি বেচার হুকুম নাই। জমি এক হাত থেকে অন্য হাতে যেতে পারে না। ধরুন, আমাদের গ্রামের অবস্থায় কী হয়? এক গ্রামে একজন কি দু'জন মহাজন বা তালুকদার অথবা জমিদার থাকে, তারা যখন লোকের কোনো বিপদ হয়, বা না খেয়ে থাকে অথবা মেয়ে বিবাহের সময় হয়, মামলা মোকদ্দমায় পড়ে, তখন গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় জমি বন্ধক দিয়ে, কেউবা বাড়ি বন্ধক দিয়ে। দেখা যায়, আস্তে আস্তে গ্রামের বারো আনা জমি এই মহাজনদের হাতে চলে যায়, আর কৃষকরা ভূমিহীন অথবা জমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। তারপর একদিন কালের করাল গ্রাসে পড়ে বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে মারা যায়।

আর হতভাগাদের ছেলেমেয়েরা কিছুদিন মহাজনের বাড়ি কাজ করে, কিছুদিন ভিক্ষা করে জীবন রক্ষা করে, তারপর একদিন গ্রাম ছেড়ে পেটের তাগিদে অন্য কোথাও চলে যায়। আর ফিরে আসে না। এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হয়। বোধ

হয়, প্রকৃতির কোলে চিরদিনের জন্য আশ্রয় নেয়। তাদের ছেলেমেয়েগুলি না খেয়ে থাকতে থাকতে একদিন ব্যারাম হয়ে মারা যায়। আমরা বলি অসুখ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু না খেতে না খেতে যে ব্যারাম হয়, তারপর মারা যায়, একথা আমাদের দেশে বলে না। কারণ, সরকারের থেকে খবর নিলে জানা যায় যে, না খেয়ে মরে নাই, ব্যারাম হয়ে মারা গেছে। যদি কেউ না খেয়ে মরার খবর দেয় তবে তার কৈফিয়ত দিতে কাজ সারা হয়ে যায়। আর যদি কোনো খবরের কাগজে প্রকাশ হয়, তবে কাগজআলার কাগজটা দেশের নিরাপত্তার নামে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর বেচারার আমার মতো নিরাপত্তা আইনে জেল খাটতে খাটতে জীবন শেষ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছে এই খবরটা বন্ধ করার জন্য অথবা প্রতিবাদ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হয়। নয়াচীনে এরকম খবর রটলে সরকার এর খোঁজ নেয় কী জন্য লোকটা মারা গেছে। কতদিন না খেয়ে ছিল? জমি জমা কী পরিমাণ আছে? এরকম ঘটনা যেন আর ভবিষ্যতে না হয়। এই না খেয়ে মরার জন্য লোকাল কর্মচারীদের কৈফিয়ত দিতে হয়, আর আমাদের দেশে এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়। আপনারা বুঝতে পারবেন যদি আমি একটা ঘটনা বলি। আমাদের পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের জনৈক মন্ত্রী খুলনার দুর্ভিক্ষ এলাকা ভ্রমণ করে বললেন যে, "লোকে না খেয়ে মরছে না, মরছে পুষ্টির অভাবে।" পুষ্টির অভাব হয় কেন? এই কৈফিয়ত কে জিজ্ঞাসা করে? আর করলেই বা উত্তর দেবার জন্য লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী বাধ্য হবে কেন? কারণ তারা জানে নিরাপত্তা আইন তাদের হাতে আছে। ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে বিনা ওয়ারেন্টে যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখতে পারে বছরের পর বছর।

যা হোক, নয়াচীন বেকার সমস্যা দূর করতে চেষ্টা করছে। এজন্য তারা নজর দিচ্ছে, কুটির শিল্পের দিকে। কুটির শিল্পে সরকারের থেকে সাহায্য করা হয়। হাজার হাজার বেকারকে কাজ দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের তাঁতিদের মতো লক্ষ লক্ষ তাঁতি কাপড় তৈয়ার করে, সুতা কেটে জীবনধারণ করে। সরকার তাদের অল্প দামে সুতা দেয়, যাতে তারা কলের কাপড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কাপড় উৎপাদন করতে পারে। আমাদের দেশে বিদেশ থেকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম সুতা এনে বড় বড় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সুতা বিলি করা হয়, যা কালোবাজারিতে বিক্রি হয়ে গরিব তাঁতিদের কাছে যখন পৌঁছে তখন দাম অনেক পড়ে যায়। তাই কাপড় তৈয়ার করে মিলের কাপড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পারে না। আমাদের সরকার বড় বড় কালোবাজারিদের দিয়ে বিদেশ থেকে কাপড়, সুতা আনায়। আর তা বেশি দামে বিক্রি করা হয় বাজারে। ফলে, একদিকে গরিব জনসাধারণের বেশি দামে কাপড় কিনতে হয়, আর অন্যদিকে তাঁতিরা সুতার অভাবে তাঁতের কাজ ছেড়ে দিয়ে বেকার হয়।

নয়াচীন সরকার কাপড়ের কলগুলিকে হুকুম দিয়েছে সুতা তৈয়ার করতে, সেই সুতা বিলি করা হয় সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে গরিব তাঁতিদের কাছে। গরিব তাঁতিরা কাপড় তৈয়ার করে সরকারি স্টোরে জমা দেয়। এভাবে লক্ষ লক্ষ বেকার তাঁতি কাজ পাচ্ছে, বিদেশি কাপড় আনতে হচ্ছে না। কাপড়ের মিলগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে সুতা তৈয়ার করছে এবং কাপড় তৈয়ার করছে। এদিকে ফ্যাক্টরিগুলিও পুরা উদ্যমে কাজ করছে আর লোকেও কাজ পাচ্ছে। তাঁতি কাপড় তৈয়ার করে আরামে দিন কাটাচ্ছে।

কুটিরশিল্পের অর্থ শুধু কাপড় তৈরি নয়। আরও অনেক কাজ করার জন্য সরকার হুকুম দিয়েছে এবং সাহায্য করছে। যেমন টেবিল, চেয়ার, খাট, হাঁড়ি, পাতিল, কাঁচি, ক্ষুর নানা প্রকারের জিনিস করার জন্য সরকার সাহায্য করে। অনেকে আবার সাবান তৈয়ারও করে। কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসই বিদেশ থেকে আনা হবে না বলে সরকার হুকুমও যেমন দিয়াছে আবার জনগণকে সেসকল জিনিস উৎপাদন করার জন্য সাহায্যও করছে।

এছাড়াও সরকার জনগণের সাহায্যে বড় বড় শিল্প গড়ে তুলছে, তাতে হাজার হাজার লোক আজ কাজ পাচ্ছে। দেশে শিল্প গড়ে না তুললে বেকার সমস্যা দূর করা যায় না। তাই নয়া সরকার সেদিকে খুব নজর দিয়েছে বলে মনে হয়। আমি অনেক বড় বড় সরকারি কর্মচারী ও শান্তি কমিটির সম্পাদকের সাথে আলাপ করেছি দোভাষীর মাধ্যমে। সাধারণ লোকের সাথে আলাপ করে যতদূর জানা যায়, তাতে এই মনে হলো যে, বেকার সমস্যা দূর করতে আরও ২/৩ বৎসর সময় লাগবে। তবে সাংহাই ইংরেজি দৈনিক কাগজের সম্পাদকের সাথে আলাপ করে তাঁর কাছ থেকে অনেক খবর পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ বেকার আছে, তাদের সরকার টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছে। কাহারও ছয় মাস লাগবে, কাহারও ১ বৎসর, আর কাহারও ৪ বৎসর লাগবে। এদের ট্রেনিং হওয়ার সাথে সাথে কাজ মিলে যাবে। ট্রেনিংয়ের সময় সরকার এদের অ্যালাউন্স দেয়, যদিও তা যথেষ্ট নয়। তবে কোনোমতে চলে যায়। নতুন রাষ্ট্র—অর্থের অভাব, বেকার সমস্যা দূর করতে ও অন্যান্য কাজ করতে সময় লাগবেই তো!

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কয় বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যা দূর করতে পারবেন?" তিনি উত্তর করলেন, "কমপক্ষে আর ৩ বৎসর সময় আমাদের লাগবে। তিন বৎসর পরে যদি কোনোদিন আসেন তবে দেখতে পাবেন, একটাও আর বেকার লোক নয়া চীনে নাই।" কত বড় সংকল্প এদের মনে! এরা এত বড় একটা বিরাট বেকার সমস্যা চিরদিনের জন্য দেশ থেকে মুছে দিতে চায়। দুনিয়ার অনেক বড় উন্নতিশীল দেশও আজ পর্যন্ত বেকার সমস্যা দূর করতে পারে নাই। বারবার চেষ্টা করেও প্ল্যানের পর প্ল্যান করেও তারা কৃতকার্য হতে পারে নাই। তার কারণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজব্যবস্থা। যার আলোচনা এখানে আমি করতে চাই না।

দুনিয়ার মধ্যে চীনদেশ বেশ্যাবৃত্তির জন্য বিখ্যাত ছিল–বিশেষ করে সাংহাই শহর। কারণ, এ শহরটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহরের মধ্যে অন্যতম। এই বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে নয়াচীন সরকার জেহাদ ঘোষণা করলো। আইন করে না, মানবীয় ব্যবহার দ্বারা। সমাজসেবক ও নিঃস্বার্থ কর্মীদের ওপর ভার পড়লো এই মেয়েরা কেন বেশ্যা হয় এবং এমন কুৎসিতভাবে জীবনযাপন করে অনুসন্ধানে তা বের করার! এরা কিছুদিন পর্যন্ত এদের অনেকের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিল। আর একদিকে সরকার একটা কমিটি নিয়োগ করলো–কী করে এদের কাজ দেওয়া যায়, সমাজে পুনর্বাসন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে। মানুষ না খেতে পেয়ে পেটের জন্য কী করতে পারে তা এদের জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়। যাদের ইতিহাস নেওয়া হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই হলো না খেতে পেরে উপায়হীন অবস্থায় এসে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। আবার অনেকের জীবনীতে জানা যায় যে, তখন চীনদেশে মেয়ে বিবাহ দিতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হতো; আর বিবাহ না হলে সেইসব মেয়েদের বৃদ্ধ পিতামাতা সমাজে মুখ দেখাতে পারত না। এমনকি দেশের লোক তাদের সামাজিক ব্যাপারে একঘরে করে রাখত। তাতে অনেক মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। আমার কতগুলি কেসস্টাডিতে পাওয়া গেল যে, অনেকে চরিত্রহীন যুবকের সাথে প্রেমে পড়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছে–এই প্রলোভনে যে অন্য জায়গায় যেয়ে তাদের বিবাহ হবে। কিন্তু যুবকটা যতদিন সম্ভব উপভোগ করে পরে একদিন তাকে ফেলে পালিয়ে চলে যায়। মেয়েটা আর কী করে? ঘরেও ফিরে যেতে পারে না, আর বাঁচবার মতো উপায়ও থাকে না, বাধ্য হয়ে গণিকালয়ে স্থান নেয়।

এ শুধু চিয়াং কাইশেক আমলের চীনেই ছিল না। এ রকম ঘটনা আমাদের দেশেও সচরাচর ঘটেছে। চীনের এই রিপোর্টগুলি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হলো। কারণ আমার দেশের কথা তখনই মনে পড়লো। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে আমি দেখেছি কত ভদ্র পরিবারের মেয়েরা সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছে, না খাওয়া বাবা-মাকে খাওয়াবার জন্য। হাজার হাজার মেয়ে দুর্ভিক্ষের সময় চার পয়সা দু'পয়সার জন্য সতীত্ব দিয়েছে। এমন খবরও আমি জানি স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে ব্যবসা করিয়ে কোনো মতে সংসার চালিয়েছে। আমি তখন রিলিফের কাজ করতেছিলাম। আইএ পরীক্ষা না দিয়া রাতদিন রিলিফের কাজ করতাম। আমার সাথে অনেক ভিখারির আলাপ হয়েছে। চোখের পানি ফেলে দিয়ে তারা বলেছে, বাবা পেটের দায়ে আর কী করি?

এমনকি ১৯৫৩ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় সাতক্ষীরা মহকুমায় যখন মওলানা ভাসানী সভা করতে যান, তখন গরিব মেয়েরা এসে মওলানা সাহেবকে বলেছে, "হুজুর, এখন আর কেউ আমাদের ভিক্ষাও দেয় না। তাই স্বামীর অনুমতিতে ইজ্জত দিয়ে কোনো রকমে এক বেলা বা একদিন পরে একদিন চারটা খাই।"

পেটে খাবার না থাকলে কোনো ধর্ম কথায়ই মানুষ ঈমান রাখতে পারে না। পেটের দায়ে মানুষ নর্দমা থেকে কুড়াইয়া খায়। যখন মা দেখে যে তার ছেলেমেয়ে কলিজার কলিজা, না খেয়ে এবং বিনা ওষুধে আস্তে আস্তে কোলে বসে শুকিয়ে শুকিয়ে মারা যায়, অথচ একটু খাবার দিলেই তার কলিজার ধন বাঁচতে পারে, কিন্তু কোনো উপায় নাই; ভিক্ষাও পাওয়া যায় না, তখন তার পক্ষে ইজ্জত দিয়ে খাবার জোগাড় করতে একটুও দ্বিধা হয় না। তাই চিয়াং কাইশেকের চীনের মেয়েরা পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হলো, মেয়েদের বিবাহ হওয়া তখন কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এতে অনেক অর্থের প্রয়োজন হতো। আজ আমাদের সমাজেও একই ভাব দেখা দিয়াছে। কোনো ছেলে লেখাপড়া শিখলে, একটু ভালো চাকরি পেলেই ভাবে যে, বিবাহ করে বেশ কিছু টাকা ও গহনা এবং খাটপালঙ্ক পাওয়া যাবে। মেয়ে মনমতো হলেই শুধু চলবে না, সম্ভব হলে বাড়ি, না হয় গাড়ি, না হয় নগদ টাকা যৌতুক চাই। গরিব ভদ্রলোক মেয়েকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছে এখন আবার টাকার দরকার বিবাহ দিতে। কোথায় টাকা পাবে? বাড়ি থাকলে বিক্রি করতে পারতো, তা নাই। নগদ টাকা নাই, বাধ্য হয়ে বলতে হয় কী করবো? কিছুই আমার দেবার নাই। তখন আর মেয়ের বিবাহ হবে না। মেয়ের বিবাহ না হলে সমাজ ঘৃণা করবে, তখন সেই মেয়ের আর কী উপায় থাকে? আস্তে আস্তে আমাদের সমাজে এই ঘৃণ্য ব্যাধিটা ঢুকে পড়েছে। এই দোষটা যখন আরো প্রকট হয়ে দেখা দিবে, তখন সমাজের ধ্বংসের আর বেশি দিন বাকি থাকবে না। তখন মেয়েরা সমাজে মুখ দেখাতে না পেরে তাদের পথ তারা দেখবে। আমি আমার দেশের মেয়েদের অনুরোধ করবো, যে ছেলে এইভাবে অর্থ চাইবে তাকে কোনো মেয়েরই বিবাহ করা উচিত না। সময় থাকতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত মেয়েদের এগিয়ে আসা উচিত। মানবসৃষ্ট এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলজনিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমাদের মতো বহু যুবকের সাহায্যও তারা পাবে।

চিয়াং কাইশেকের আমলের এই অন্যায় অত্যাচার সমাজ থেকে নয়াচীন তুলে দিয়েছে।

আমি আমার দোভাষীর মাধ্যমে সাংহাই শান্তি কমিটির নেতার সাথে আলাপ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা বেশ্যাবৃত্তি কী করে তুলে দিলেন? তারা বললো : আইন করে তুলে দেন নাই। তবে কি অত্যাচার করে তুলে দিয়েছেন?" উত্তরে বললেন, "না, অত্যাচার করেও তুলে দেই নাই। আবার আইন করেও তুলে দেই নাই। আইন করে তুলে দিলে কি হবে, এদের তো বাঁচাতে হবে! এদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেই তারপর আইন করা যায়। শুধু আইন করলেই কোনো কাজ হয় না। আমাদের সরকার প্রথম গণনা করলো কত বেশ্যা চীনদেশে আছে। তারপর তাদের জন্য কিছু কাজের ব্যবস্থা করা হলো। আমরা প্রত্যেক সমাজসেবক প্রথমে তাদের কাছে যেয়ে বোঝাতে

লাগলাম, তোমরা এ বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দেও। তোমাদের কাজের বন্দোবস্ত করে দিতেছি। তোমরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করবা অন্য মেয়েরা যেভাবে করে, তারপর যাকে পছন্দ করবা তার যদি মত হয়, তবে তোমাদের বিবাহ হবে, সংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে। তোমরা সাধারণ মানুষের মতো বাস করতে পারবা। এভাবে জীবন নষ্ট করে তোমাদের লাভ কী? এইভাবে দলে দলে কর্মীরা তাদের সাথে দেখা করে আলোচনা করতে শুরু করলো। একমাত্র সাংহাই শহরে ৪০ হাজারের বেশি বেশ্যা ছিল। আলোচনার ফল কিছুটা ভালো হলো। প্রথমে শতকরা ৩০ জন বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে কাজ নিতে রাজি হলো। তাদের সকলের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হলো, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ফ্যাক্টরিতে কাজ দেওয়া হলো। কয়েকমাস পরে আবার কর্মীরা বাকি বেশ্যাদের কাছে যেয়ে বোঝাতে লাগলো এবং বললো, তোমরা দেখে আসো আগে তোমাদের সাথে যারা ছিল তাদের অবস্থা কেমন করে ফিরে গেছে। তারা সংসারে স্থান পেয়েছে, অনেকের বিবাহ হয়েছে, বাড়ি পেয়েছে। তাদের অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে। সে সময় আরো প্রায় শতকরা ৩০ জন বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ নিলো। কিন্তু যে সমস্ত বেশ্যা বাকি ছিল তারা কিছুতেই আসতে রাজি হয় নাই। অনেকে পালাইয়া চলে গেল হংকং ও চীনের বাইরে, অনেকে গা ঢাকা দিলো।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, “যারা গা ঢাকা দিয়াছে তারা অনেকে এখনও গোপনে বেশ্যাবৃত্তি চালাইতেছে?” উত্তর দিলো, “হয় তো অনেকেই গোপনে বড় বড় শহরে ব্যবসা চালাচ্ছে, তবে সরকার ও কর্মীরা তাদের ধরবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে।” আমি বললাম, “বেআইনি করেন নাই, তবে ধরবার চেষ্টা করছেন কেন? কী অধিকারের বলে আপনারা তাদের ব্যবসা চালাতে দেন নাই?” তিনি বললেন, “বেআইনি করা লাগে না, আমরা প্রোপাগান্ডা করে জনমত গঠন করেছি। জনমতের ভয়ে কেউ আর গণিকালয় যেতে সাহস পায় না। ধরার অর্থ হতেছে আমরা রোজ যেয়ে ওদের পরামর্শ দেই এবং জীবন অতিষ্ঠ করে তুলি। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে, তারা আর এ ব্যবসা ছাড়তে রাজি না। তারা মনে করে তাদের স্বাধীনতা থাকবে না। তারা কাজ না করেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারে। এক কথায় নয়াচীন থেকে বেশ্যাবৃত্তি তুলে দেওয়া হয়েছে, আইন করে হোক, আর বেআইনি হোক, আর কাজ দিয়েই হোক।”

আমাদের রাজধানী করাচিতে আইন করে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আমি জানি প্রায় সকল হোটেলেই এই ব্যবসা চলে থাকে। আইন করে কোনো অন্যায় কাজই বন্ধ করা যায় না, অন্যায় বন্ধ করতে হলে চাই সুষ্ঠু সামাজিক কর্মপন্থা, অর্থনৈতিক সংস্কার ও নৈতিক পরিবর্তন।

নয়াচীনে আজকাল পূর্বের মতো মেয়েদের বাবা মায়ের টাকা দিয়া আর জামাই কিনতে হয় না। তাহারা নতুন বিবাহ আইন প্রবর্তন করেছে। ছেলেমেয়ে একমত

হয়ে দরখাস্ত করলেই তাদের যার যার ধর্মানুযায়ী বিবাহ দিতে বাধ্য। 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রী জাতি নিকৃষ্ট' এই পুরান প্রথা অনেক দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে, তাহা আর নয়াচীনে নাই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ নয়া চীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢুকে পড়ছে। পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খোদা সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছে। সুযোগ পেলে তারাও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ডাক্তার, যোদ্ধা সকল কিছুই হতে পারে। নয়াচীনের বহু পূর্বে পাশ্চাত্য দেশগুলি, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি এমনকি মুসলিম দেশ তুরস্ক নারী স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। নারীরা সেদেশে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। তুরস্কে অনেক মেয়ে পাইলট আছে, যারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পাইলটদের মধ্যে অন্যতম।

নয়াচীনের মেয়েরা আজকাল জমিতে, ফ্যাক্টরিতে, কলে-কারখানাতে, সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগদান করছে।

সত্য কথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ না করে তা হলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোনোদিন বড় হতে পারে না।

নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হওয়াতে আজ আর পুরুষ জাতি অন্যায় ব্যবহার করতে পারে না নারী জাতির ওপর। আমাদের দেশের কথা চিন্তা করে দেখুন। যদিও আইনে আমাদের দেশে নারী পুরুষের সমান অধিকার, তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের মনে এই ধারণা যে, পুরুষের পায়ের নিচে মেয়েদের বেহেস্ত। পুরুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মেয়েদের নীরবে সব অন্যায় সহ্য করতে হবে বেহেস্তের আশায়। তার চেয়ে বড় কথা হয়েছে, মেয়েদের নির্ভর করতে হয় পুরুষদের অর্থের ওপর। কারণ আমাদের দেশে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কিছু সংখ্যক মোল্লা পর্দা পর্দা করে জান পেরেশান করে দেয়। কোনো পরপুরুষ যেন মুখ না দেখে। দেখলে আর বেহেস্তে যাওয়া হবে না। হাবিয়া দোজখের মধ্যে পুড়ে মরবে। আমার দেশের সরলপ্রাণ গরিব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের কথা বিশ্বাস করে আর বেহেস্তের আশায় পির সাহেবদের পকেটে টাকা গুঁজে দেয়, আর তাদের কথা কোরআন হাদিসের কথা বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইসলামিক ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, মুসলমান মেয়েরা পুরুষদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেত, অস্ত্র এগিয়ে দিতো। আহতদের সেবা শুশ্রূষা করত। হজরত রসুলে করিমের (সা.) স্ত্রী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা নিজে বক্তৃতা করতেন, 'দুনিয়ায় ইসলামই নারীর অধিকার দিয়াছে।'

আমাদের দেশে অনেকে চার বিবাহ করে। পুরুষ যদি চার বিবাহ করে তবে মেয়েরা অন্যায় করেছে কি? কোরআনে একথা কোথাও নাই যে, চার বিবাহ করো। কোরআনে মজিদে লেখা আছে যে, এক বিবাহ করো। তবে তুমি দুই বা তিন বা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো যদি সকল স্ত্রীকে সমানভাবে দেখতে

পারো। কিন্তু আমি প্রশ্ন করি, এমন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে কি যে সমানভাবে সকল স্ত্রীকে দেখতে পারে? কোনোদিন পারে না। তাই যদি না পারে তবে চার বিবাহ করতে পারে না। আল্লাহর হুকুম সেখানে অমান্য করা হয়।

আমি একজন মওলানা সাহেবের কথা জানি, যিনি চার বিবাহ করেছেন, কিন্তু ছোট বিবিকে সাথে নিয়া ঢাকা শহরে থাকেন। আর অন্যান্য বিবিরা গ্রামে কষ্ট করে থাকেন। বৎসরে একদিনও স্বামীর সাথে দেখা হয় না তাদের। আর ছোট বিবি বৎসরের মধ্যে বারো মাস তার সাথে থাকেন। এখানে কোথায় আল্লাহর হুকুম মানা হলো? কোরানে অন্যভাবে বেশি বিবাহ করা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। নয়াচীনে বেশি বিবাহ প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে; যদি স্ত্রীকে পছন্দ না করো তবে তাহাকে তালাক দিয়া অন্য বিবাহ করতে পারো। আবার তালাক কেন দিচ্ছ তার প্রমাণ করতে হবে কোর্টে।

তবে একটা অদ্ভুত নতুন প্রথা করা হয়েছে নয়াচীনে, সেটা হলো অবিবাহিত মেয়েদের ছেলেমেয়ে হলে, সরকার সেই ছেলেমেয়েদের রাষ্ট্রের ছেলেমেয়ে হিসেবে গ্রহণ করে। নয়াচীন সরকার যে মেয়েদের অবিবাহিত কালে ছেলেমেয়ে হয় তাদের কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করে নাই। অন্যপক্ষে, যদি কেউ তাদের হিংসা বা ঘৃণা করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আমি এটা স্বীকার করি যে, ছেলেমেয়েদের কোনো দোষ নাই। তারা নিরপরাধ, তাদের যদি কেউ হিংসা বা ঘৃণা করে তবে তাতে যথেষ্ট অন্যায় হবে এবং তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু যে মেয়েদের অবিবাহিতকালে ছেলেমেয়ে হয়, তাদের কোনো রকম শাস্তির ব্যবস্থা না হলে দেশে ভবিষ্যতে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে কি না সেটা ভাববার কথা। যদিও নয়াচীনের অনেকে বলেছে তাতে উন্নতি হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খলতা কমে গেছে। কারণ, ছেলেমেয়ে ইচ্ছা করলেই যখন বিবাহ করতে পারে, তখন আর মানুষ খারাপের দিকে যাবে কেন? আমার এখানে মতামত দেওয়া উচিত হবে না। কারণ আমি এদের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারি নাই। তবে প্রথাটা আমার ভালো লাগে নাই। ফলাফলের অপেক্ষায় রইলাম।

নারী-পুরুষের সমান অধিকার কায়েম হওয়ার পরে মেয়েদের ওপর যে অসম্ভব রকমের অত্যাচার পূর্বে হতো তা আজ চীনে বন্ধ হয়ে গেছে। নয়াচীন সরকারের মধ্যে বড় বড় পদ মেয়েরা আজ অধিকার করেছে যেমন, ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন আজ সহসভাপতি এবং আর একজন মহিলার সাথে আলাপ হয়েছিল তিনি হলেন নয়াচীন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাডাম লু।

যে সমস্ত ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, সরকারি অফিসে আমি গিয়াছি সেখানেই দেখতে পেয়েছি মেয়েরা কাজ করছে; তাদের সংখ্যা স্থানে স্থানে শতকরা ৪০ জনের ওপরে। নয়াচীনের উন্নতির প্রধান কারণ পুরুষ ও মহিলা আজ সমানভাবে এগিয়ে এসেছে দেশের কাজে। সমানভাবে সাড়া দিয়াছে জাতি গঠনমূলক কাজে। তাই জাতি আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে।

সরকারি কর্মচারীদের বেতন সম্বন্ধেও আমি যথেষ্ট আলোচনা করেছিলাম নেতৃবৃন্দের সাথে। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী হারে বেতন দেওয়া হয় সরকারি কর্মচারীদের? শুনে আশ্চর্য হলাম, কারণ এ কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। সে দেশে আয় হিসাবে ব্যয় করা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ৬০ কোটি লোকের বিরাট দেশের প্রধান কর্মকর্তা মাও সে তুং আমাদের টাকার ৫০০ শত টাকা মাসে গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়। নিচে ৫০ টাকা আর উপরে ৫০০ টাকার বেশি কেউ গ্রহণ করতে পারে না, আর যাতে ৫০ টাকায় সংসার চলে তার বন্দোবস্ত সরকার করে থাকেন। সরকারি দোকান থেকে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র কিনতে পারে। জিনিসের দামের সামঞ্জস্য থাকলে ৫০ টাকায় সংসার চালানো কষ্টকর হয় না। সরকার সমস্ত গরিব কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করে। তাদের থাকবার জন্য বাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়, আর চিকিৎসা যাতে পেতে পারে তারও যথাযথ ব্যবস্থা আছে। যারা বড় বড় কর্মচারী বা রাষ্ট্রপ্রধান তাঁরা ৫০০ টাকা বেতনের সাথে বাড়ি পায়, গাড়ি পায় এবং নানা সুযোগ-সুবিধা পায়। চেয়ারম্যান মাও সে তুং ৫০০ টাকা বেতন নিলেও আর সকল কিছুই ফ্রি পান। তবে তিনি নিজে ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন। যদিও সে বাড়ির কাছে সাধারণ লোক যেতে পারে না। বিরাট রাজপ্রাসাদের ভিতর, ছোট একটা দালানে থাকেন। আর সে প্রাসাদে তার নিজস্ব কর্মচারীরা থাকেন। এবং তাদের অফিস, বাড়ি খুব বেশি গার্ড দিয়ে রাখা হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনাদের নেতাকে তো সকলে ভালোবাসেন তবে তিনি ওভাবে গার্ডের ভিতর বাস করেন কেন?" তারা উত্তর দিলো, "দুনিয়া ভরা আমাদের শত্রু। মাও-কে হত্যা করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে অনেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র প্রস্তুত। তাই তাঁকে আমরা গার্ড দিয়ে রাখি। তিনি আমাদের নেতা, ৬০ কোটি লোকের আস্থা আছে তাঁর ওপর। তাঁর ওপর আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। দুনিয়ায় সৎ লোকদের শত্রুও বেশি হয়। এছাড়াও ঘরের শত্রুও আছে তা আপনারা জানেন, চিয়াং কাইশেক ও তার দলবলেরা যাদের জনসাধারণ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারা সুযোগ পেলেই আমাদের নেতাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। বিশ্বাসঘাতক সকল দেশেই আছে।" তখন আমার মনে পড়লো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী খানের কথা। যদিও অনেক বিষয়ে তাঁর সাথে আমাদের অমিল ছিল, কিন্তু আমরা কোনোদিন এটা বিশ্বাস করি না যে, অন্যায়ভাবে কোনো জাতীয় নেতাকে হত্যা করে দেশের কল্যাণ করা যায়। তাই তাঁর এই হত্যার নিন্দা আমরা করেছিলাম, যে দোষী তাকে ধরে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা বহুবার দাবি করেছিলাম।

যা হোক, বেতন ও মাহিনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে অনেক দূর চলে এসেছি। কথা হলো, আমাদের দেশে যেভাবে সরকারের থেকে বেতন দেওয়া

হয় তার চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়—রাষ্ট্রপতি বেতন পান মাসে বারো হাজার টাকা, আর বাড়ি গাড়ি সকলই ফ্রি। আর সকলের চেয়ে ছোট কর্মচারী বেতন পায় ২০/২৫ টাকা। অন্যান্য মন্ত্রী ও কর্মচারীরা বেতন পায় ২ হাজার, ৩ হাজার, ৪ হাজার করে মাসে, অনেকের বাড়ি ফ্রি, গাড়ি ফ্রি। বেতন বেশি দিতে কেহ আপত্তি করতো না, যদি রাষ্ট্রের আয় বেশি হতো। গরিব কর্মচারীদের দুঃখের সীমা নাই। একজন গরিব কেরানি ৮০/৯০/৫০/৬০ টাকা বেতন পায়। তাই দিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে হয়, কাপড়চোপড় কিনতে হয়, বাসা ভাড়া করতে হয়। আবার একটু পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। তারপর, ছেলেমেয়েদের জন্য অন্য ব্যয় আছে, নিজেদের খেয়েও বাঁচতে হয়। এর মধ্যে আবার জিনিসপত্রের দামের স্থিরতা নাই। মাঝে মাঝে কাপড়ের দাম, চাউলের দাম, বই পুস্তকের দাম, ওষুধপাতি, যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায়। তাতে দু'খানা কাপড় কিনতে অনেকের এক মাসের বেতন ব্যয় হয়ে যায়। জিনিসের মূল্যে স্থিরতা ও সামঞ্জস্য না থাকলে সামান্য বেতন বাড়লেও কোনো লাভ হয় না। তাই জিনিসের দামের স্থিরতা এবং ন্যায্যমূল্য ও সামঞ্জস্য থাকা চাই। তাহলেই গরিব কর্মচারীরা কোনোমতে বাঁচতে পারে। তাদের ছেলেমেয়েদের ফ্রি শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত এবং সাথে সাথে তাদের জন্য অল্প খরচে বাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া উচিত—যাতে তাদের বেশি ভাড়া দিয়ে বাড়ি ঠিক করতে না হয়। আমি যখন জেলে ছিলাম এক সিপাহি আমাকে বলেছিল যে, "৬০ টাকা বেতন, তার মধ্যে বাসা ভাড়া দিতে হয় ১৮ টাকা। কারণ যে সামান্য কয়েকটা সরকারি বাড়ি আছে তাহা অন্য সিপাহিদের দেওয়া হয়েছে। আমাকে দেওয়া হয় নাই। কারণ আমি বড় কর্তাদের দালালি করতে পারি নাই।" আমি বললাম, "তাদের যদি না দেওয়া হতো তাহলে তো তাদেরও আপনার মতো দশা হতো। তাই একই কথা। এটা সত্য কথা যে একদিনে হয় না, কিন্তু সুষ্ঠু কর্মপন্থা থাকা দরকার।"

নয়াচীনেও সরকার সকলের বাসস্থান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরী করতে পারে নাই। সকলকে বাড়ি দিতে পারে নাই। আমাকে তারা বলেছে যে, সকলকে সমানভাবে রাখতে, আমাদের আরো সময় লাগবে।

আমাদের দেশে প্রোপাগান্ডা হয় যে, নয়াচীনে সকলকে সমান করে দেওয়া হয়েছে—তা সত্য নয়। বড় বড় কর্মচারী গরিব কর্মচারীদের থেকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা বেশি পায়! তাদের বেতনও বেশি। একথা সত্য যে, চীনে সকলে যাতে বাঁচবার মতো সুযোগ সুবিধা পায় তা সকলকে দেওয়া হয়। একজনে চাকরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা করে, আর একজন না খেয়ে কষ্ট করে, তাহা উঠে গেছে। আরাম করো আপত্তি নাই, তবে কেউ না খেয়ে থাকতে পারবে না, এই হলো নীতি। তাই আজকাল নয়াচীনে কোনো কর্মচারী ঘুষ খেতে পারে না,

আর খেতে চায়ও না। যদি ঘুষ ধরা পড়ে তবে তার সেই মুহূর্তে ভীষণ শাস্তি পেতে হয়। তারা বলে, তোমাদের বেতনে যখন সংসার চলে যাচ্ছে তখন ঘুষ খাও কেন? আমাদের দেশের কথা আলাদা, এখানে ঘুষ না খাওয়াই ব্যতিক্রম। অনেকে পেটের দায়ে ঘুষ খেতে বাধ্য হয়। আর অনেকে ব্যাংকে টাকা জমা করার জন্য খায়। ইংরেজ আমলে বড় বড় কর্মচারীরা একটু কম ঘুষ খেত। এখন অনেকেই ঘুষ খায়।

আমি জানি, অনেক কর্মচারী দুই তিন হাজার টাকা বেতন পায়, তথাপি ঘুষ খায়। এও জানি ২০০ টাকা বেতন পায় তার মধ্যেই সংসার চালায়, ছেলেমেয়ের স্কুল-কলেজের খরচ দেয়, তারপরও চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে ঢাকা শহরে বাড়ি কেনে বা করে।

১৪ বৎসরে রাজনীতিতে আমার শিখবার ও দেখবার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। পূর্বে শুনতাম, দারোগা পুলিশের মতো ঘুষ কেউ খায় না। তারপর শুনতাম, সিভিল সাপ্লাইয়ের মতো ঘুষ কেউ খায় না, তারপর শুনতাম কাস্টমস অফিসারদের মতো ঘুষ কেউ খায় না। আমি কয়েক বৎসর রাজবন্দি হিসেবে জেল খেটেছি, তাতে দেখেছি জেলখানার ঘুসের মতো বৈজ্ঞানিকভাবে ঘুষ বোধ হয় কোনো ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা নিতে জানে না। কোনো দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মচারীর উপায় নাই যে সে ঘুষ ধরে! জেলখানা, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, কাস্টমস্, কোর্ট-কাচারি, সাব রেজিস্ট্রার অফিস, ইনকাম ট্যাক্স, কারো চেয়ে কেউ কম না, এই ধারণাই আমার শেষ পর্যন্ত হয়েছে। জাতির নৈতিক পরিবর্তন ছাড়া ও সুষ্ঠু কর্মপন্থা ছাড়া দেশ থেকে দুর্নীতি ও ঘুষ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এই দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করা দরকার। নিরাপত্তা আইন যদি ব্যবহার করতে হয় তবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে বোধ হয় জনসাধারণ এই নিরাপত্তা আইনের কোনো সমালোচনা করত না। সকলের চেয়ে দুঃখের কথা হলো, অনেক দুর্নীতিপরায়ণ নেতা দেশে আছে যারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলাইয়া চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করে। যখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো সৎ কর্মচারী মামলা দায়ের করতে চায় তখনই বড় বড় মন্ত্রীরা এই সমস্ত কর্মচারীদের বদলি করে মামলা ধামাচাপা দেয়।

নয়াচীন থেকে দুর্নীতি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ঘুষ দুর্নীতি তুলে দিতে বদ্ধ-পরিকর। আমি নয়াচীনে একটা ঘটনা শুনেছিলাম যে, মাও সে তুংয়ের একজন প্রধান বন্ধু এবং নয়াচীনের নেতা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে তাকে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছা করলে মাও সে তুং তাকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু বিচারে যাকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছে তাকে রক্ষা করা অন্যায়। ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফাদের সময় এইভাবে ভাইকেও অন্যায় করলে খলিফারা ক্ষমা করতেন না। দরকার হলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতেন। এরকম বহু ইতিহাস আছে। দুঃখের বিষয়

কয়েকজন মুসলমান নামধারী নেতা পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি, ঘুষ ও চোরাকারবারিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিজেরাও অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। দেশের রাষ্ট্রনায়করা যদি দুর্নীতিপরাছু হয় তবে আর দেশের কর্মচারী ও জনগণ দুর্নীতিপরাছু কেন হবে না?

দুর্নীতি সমাজের ক্যানসার রোগের মতো। একবার সমাজে এই রোগ ঢুকলে সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। আমাদের দেশের বিচারে একটা লোক আর একজনকে হত্যা করলে বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ডাকাতি করলে বা চুরি করলে তাকে কয়েক বৎসর ধরে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একটা লোক হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে আর একটা লোককে হত্যা করলো, যাকে হত্যা করা হয় তার সংসারটা খতম হয়ে যায়। কারণ, সেই লোকটার ওপর সমস্ত সংসার নির্ভর করে। কিন্তু চোরাকারবারিকে ফাঁসি দেওয়া হয় না, ফাঁসি যদি কাহাকেও দিতে হয়, তবে চোরাকারবারি ও দুর্নীতিপরাছু লোকদেরই দেওয়া উচিত। একজন চাউলের চোরাকারবারি লক্ষ লক্ষ মণ চাউল জমা রেখে লক্ষ লক্ষ লোককে না খাইয়ে মারে। আর একজনকে হত্যা করলে যদি ফাঁসি হয়, তবে হাজার হাজার লোকের যারা মৃত্যুর কারণ তাদের কী বিচার হওয়া উচিত? ধরুন, একজন কাপড়ের চোরাকারবারির জন্য অনেক মহিলা ইজ্জত রক্ষা করার সামান্য কাপড় যোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। তবে তার বিচারে কী হবে? সে তো লক্ষ লক্ষ নারীর ইজ্জত ও জীবন নষ্ট করেছে। আমি জানি আমাদের দেশের এক স্বনামধন্য মুসলিম লীগওয়ালা একমাত্র কাপড়ের চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। তবে ইলেকশনে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও ভোট পান নাই। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য সরকারি কর্মচারীরা চেষ্টা করেছিল, তখন তাদের বদলি করে দিয়ে সেই চোরাকারবারিকে রক্ষা করা হয়েছিল। এমনকি শোনা যায় যে, ফাইলগুলি পূর্ব বাংলা থেকে উড়ে করাচি চলে গিয়াছিল এবং কোনো এক মন্ত্রীর বাক্সের মধ্যে ফাইলগুলি আটকাইয়া রাখা হয়েছিল। এতবড় যেখানে দুর্নীতি সেখানে সরকারি কর্মচারীরা কোন সাহসে বড় বড় চোরাকারবারিদের গায়ে হাত দেবে?

নয়াচীনকে এখানে সত্যিকারের ধন্যবাদ দিতে হয়। কোনো দোকানদারও ঠিক করা দামের চেয়ে এক পয়সা বেশি নিতে সাহস পায় না। কারণ, তারা জানে সরকার টের পেলে আর উপায় থাকবে না। সেখানকার সরকার দেশের থেকে দুর্নীতি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। যারা দুর্নীতিপরাছু তাদের ওপর কারো মায়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, ভালোবাসা নাই, সকলেই তাকে ঘৃণা করে। সাধারণ লোক এই সমস্ত দুর্নীতিপরাছু লোকদের দেখলে নাকি মুখে থুথু দেয়। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে এরকম গল্প নয়াচীনে শুনেছি। সে দেশের লোকও সাড়া দিয়াছে সরকারের দুর্নীতি নির্মূল কর্মকাণ্ডে। যদি কোনো কর্মচারী ঘুষ নেয় বা চায় তবে তার আর রক্ষা নাই, তখন জনগণ একমত হয়ে তার বিরুদ্ধে

আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারও তখন কঠোর ব্যবস্থা নেয়। আমাদের দেশে জনগণ সত্যই এভাবে এগিয়ে আসে নাই। সরকারও কঠোর হয় নাই।

একদিন এক বাড়িতে আমি গিয়াছিলাম, নাম বলবো না বা ঠিকানা দিবো না। সে ভদ্রলোকের একটা ছেলে ছিল, আমার সাথে পড়তো। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ছেলে কোথায়?" তিনি বললেন, "ও চাকরি করে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী চাকরি করে?" বললেন, "চাকরি বেশি ভালো না, তবে এক শত টাকা বেতন পায় আর কিছু উপরিও আছে।" উপরি, মানে ঘুষও পায়। আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর নিজকে আমি সামলিয়ে নিয়ে বললাম, "তবে তো বেশ ভালোই আছে!"

ভেবে দেখুন, সমাজ কোথায় গিয়েছে! ছেলে ঘুষ খায় পিতা তাহা গর্বের সাথে ঘোষণা করে। সমাজ কত নেমে গেলে এই অবস্থায় আসতে পারে!

আমার দেশের এক নেতা একদিন আমার কাছে গর্ব করে বলেছিলেন যে, তাঁর জামাই এক পয়সা বাড়ির থেকে না নিয়ে ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। আমি একটু মুখপোড়া মানুষ, মনে যা আসে এবং তা সত্য হলে মুখের ওপর বলে দিই। কাউকেও ভয় করি না। আর চক্ষুলজ্জা একটু কম। বললাম, "বিনা টাকায় ব্যবসা হয় এটা তো জানতাম না!" তবে হয়, আমাদের দেশের পীর সাহেবদের। ফুঁ দিয়া ধর্মের কথা বলে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড় বড় ঘর করে ও জমি কেনে, কোনো কাজ কর্ম করে না। এটা একটা ব্যবসা। আর একটা ব্যবসা রাতে ঘরে সিং কাটা, অথবা ডাকাতি করা। যাতে কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না। আর একটা ব্যবসা আছে যেটা বিনা টাকায় হয় সেটা বেশ্যাবৃত্তি করা। এছাড়া বিনা টাকায় কোনো ব্যবসা হয় বলে আমার জানা নাই। এখন আমাদের দেশের নতুন এক ব্যবসা হয়েছে 'পারমিটের ব্যবসা।' মন্ত্রীদের দালালি করে, যদি একটা পারমিট পাওয়া যায় তা বিক্রি করলে কিছু টাকা আসে। যদিও সেই পারমিট বিক্রিতে গরিবের অনেক ক্ষতি হয়। তবু টাকা পাওয়া যায়।

নয়াচীন থেকে ঘুরে এসে আমার এই মনে হয়েছে যে, জাতির আমূল পরিবর্তন না হলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা কষ্টকর। নতুন করে সকল কিছু ঢেলে সাজাতে হবে। ভাঙা দালানে চুনকাম করে কোনো লাভ হয় না–বেশি দিন টিকে না। আবার ভেঙে পড়ে। পুরান দালান ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুললে, ঘুণ ধরতে বা ভেঙে পড়তে অনেক সময় লাগে। সাথে সাথে ভিত্তিটা মজবুত করতে হয়। ভিত্তি মজবুত না হলে সামান্য বাতাসে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, নয়াচীনে দেখেছি তারা ভিত্তি মজবুত করে কাজ শুরু করেছে।

সত্য কথা বলতে কি–নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন তাদের ব্যবহার। মনে হয় সকল কিছুর মধ্যেই নতুনত্ব।

আপনাদের জানা আছে, চীন দেশ ৬০ কোটি লোকের দেশ। তিন সম্প্রদায়ের লোকেরা সে দেশে বাস করে। শতকরা প্রায় ৮০ জনই বৌদ্ধ, প্রায় ৫ কোটি মুসলমান আর কিছু খ্রিষ্টান। কয়েকটা প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, এমনকি শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান। আর অন্যান্য প্রদেশেও মুসলমান কিছু কিছু আছে। চিয়াং কাইশেকের সময় বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হতো। হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা যেত। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার চালাতো। ধর্মের নামে বহু জুয়াচুরি চলতো। কুসংস্কার দেশের মধ্যে অনেক বেশি ছিল।

সিং কিয়াং প্রদেশের গভর্নর জনাব বোরহান শহীদ, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব হালিম ও একজন সাধারণ কর্মী জনাব ইউসুফের সাথে আলাপ করে মুসলমানদের দুরবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। জনাব ইউসুফের দুই ভাইকে চিয়াং কাইশেকের সৈন্যরা হত্যা করেছিল। তাঁর বৃদ্ধ পিতাকেও হত্যা করা হয়েছিল, বাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়েছিল–এই জন্য যে তারা মাও সে তুং সরকারের সমর্থক ছিলেন। ইউসুফ আমাকে বলেছিল যে, সাধারণ মুসলমানরা চিয়াং কাইশেককে সমর্থন করত না। কারণ, তার শাসনের সময় মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হতো। তার সময় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে মুসলমানদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, তার অনেক নজির আছে। বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে, যাদের অনেকের নাম সে আমাকে বলেছিল, মনে নাই।

তখন ধর্মের নামে শোষণ চলতো। ধর্মকে ব্যবহার করা হতো শোষক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য। শুধু মুসলমান ধর্মের মধ্যেই এই প্রবণতা ছিল না, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই ছিল। সকলের চেয়ে বেশি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে। রাষ্ট্রনায়করা বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসেবে দেশকে ধর্মের নামে শাসন ও শোষণ করতো এবং ধর্মকে ব্যবহার করতো নিজেদের স্বার্থের জন্য। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতি তখন আর ছিল না, সেটা হিংসায় পরিণত হয়েছিল। হাজার হাজার লোককে গুলি করে হত্যা করে চিয়াং কাইশেকের দল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে রাখতো নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এটা শোষক সম্প্রদায়ের নীতি। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতো। যখন জনগণের ভিতর গণ আন্দোলন শুরু হতো, তারা ভাত কাপড় দাবি করত, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হতো, তখনই শোষক গোষ্ঠী এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিত, যাতে তাদের গণ আন্দোলনকে অন্যদিকে ধাবিত করতে পারে। এবং দেখা যেত অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের বাঁচবার দাবি ভুলে যেয়ে সম্প্রদায়গত স্বার্থকে বড় করে দেখতো। এটা শোষক গোষ্ঠীর নিয়ম। যুগ যুগ ধরে এই নিয়মে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা তাদের শোষণ ও শাসন চালাতো।

মানুষ যদি সত্যিকারভাবে ধর্মভাব নিয়ে চলত তাহলে আর মানুষে মানুষে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এইভাবে যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম হতো না। কিন্তু মানুষ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ধর্মের অর্থ যার যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চালাতে চেষ্টা করেছে। সেই জন্য একই ধর্মের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। ধরুন রসুলে করিম (দ.) ইসলাম ধর্মকে যেভাবে রূপ দিয়েছিলেন সেইভাবে যদি ধর্ম চলতো তাহা হলে আজ আর মানুষে মানুষে এ বিরোধ হতো না। কিন্তু সেই ইসলাম ধর্মের মধ্যে কত বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সুন্নি, শিয়া, কাদিয়ানি, ইসমাইলি, আগাখানি, আবার মোহম্মদি, ওহাবি, কত রকমের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে একই ধর্মের মধ্যে। এর অর্থ কী? আমরা দেখতে পেয়েছি শুধু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরাই একে অন্যের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে নাই। শিয়া সুন্নি দাঙ্গার কথা আপনারা জানেন, হাজার হাজার মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করেছে। আপনারা এও জানেন, কাদিয়ানি-শিয়া-সুন্নিদের সাথে পাঞ্জাবে যে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে তার নজির বোধ হয় ইতিহাসে বিরল। এর কারণ কী? আজ ধর্ম কোথায়? আর যারা আমাদের ধর্মের গুরু তাদের অবস্থা কী? একবার চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আমাদের দেশে এককালে এই সকল তথাকথিত ধর্মগুরু বা পীর সাহেবরা ইংরেজি পড়া হারাম বলে আমাদের জাতির কী ভয়ানক ক্ষতি করেছে। সৈয়দ আহমদ যখন ইংরেজি পড়ার জন্য আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করলেন তখন তাঁকে এই সকল পীর সাহেবরা ফতোয়া দিলো 'কাফের' বলে। জিন্নাহ্ সাহেব যখন পাকিস্তানের আন্দোলন শুরু করলেন তখন এই সমস্ত পীর সাহেবরা কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে কী জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার প্যামফ্লেট কংগ্রেসের টাকা দিয়া ছাপাইয়া দেশ বিদেশে বিলি করেছিল। ইসলামের নামে তারা কোরান ও হাদিস দিয়া প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করত যে পাকিস্তান দাবি করা, আর কোরানের খেলাফ কাজ করা একই কথা। আর একদল পীর মওলানারা বলতো এবং কেতাব কোরান দিয়া প্রমাণ করতো যে পাকিস্তান চাওয়া জায়েজ আছে।

আমার মনে আছে, যখন আমি সিলেটে গণভোটে যাই, আমার সাথে প্রায় তিনশত কর্মী ছিল। সিলেটে দেওবন্দের পাশ করা প্রায় ১৫ হাজার মওলানা আছেন। তারা প্রায় সকলে একমত হয়ে ফতোয়া দিলো যে সিলেট জেলা পাকিস্তানে যাওয়া উচিত হবে না এবং কোরান হাদিস দিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করলো। সেখানে ভোটাভুটি হবে। লোকে যদি ভোট দেয় পাকিস্তানের পক্ষে তবে সিলেট জেলা পাকিস্তানে আসবে, আর যদি হিন্দুস্তানের পক্ষে ভোট দেয় তবে হিন্দুস্তানে যোগদান করবে। আমরা সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কাজ শুরু হলো। হাজার হাজার মওলানা লম্বা জামা পরে কংগ্রেসের টাকা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন, পাকিস্তানে ভোট দেওয়া হারাম। আমরা বলতে শুরু করলাম ওরা ভাড়াটিয়া মওলানা, ওদের কথা শুনো না।

একটা ঘটনা বলতে চাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিলেটে খবর দিলেন যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্মীদের পাঠাবেন। যে জায়গায় অসুবিধা সেখানে তাদের পাঠালে খুব ভালো হবে। তার মধ্যে তিনি আমার নামও দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, আমি খুব ভালো কর্মী, আর বক্তৃতাও করতে পারি। আমাকে ও আমার দলবলকে এমন জায়গায় পাঠানো হলো যে, যেখানে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বললেই মওলানারা মারে। যারা সভা করতে পূর্বে চেষ্টা করেছে তাদের কপালে অনেক কিছু হয়েছে। আমি যাওয়ার পরে বিয়াবহ নামক স্থানে সভা করবো বলে ঘোষণা করলাম এবং সদলবলে রওয়ানা হলাম। কিছু লোক সেখানে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে লাগলো। তাদের প্রায় সকলেরই দাড়ি নাই। ভয়েতে তারা অস্থির। আমি প্রায় ৪০ জন বাছা বাছা কর্মী নিয়ে একদিন পূর্বে সেখানে পৌঁছলাম। কর্মীরা সব নেমে গেল বাড়ি বাড়ি ক্যানভাস করতে, আর দাবি করলো আপনারা ভোট না দেন কিন্তু আমাদের কিছু বলতে দেন। আপনারা শোনেন, পছন্দ না হয় ভোট দিবেন না।

দুয়ারে দুয়ারে কর্মীরা ঘুরতে আরম্ভ করলো। কিছু স্কুলের ছাত্রও আমাদের ছেলেদের সাথে জুটলো। দেশের মধ্যে কিছু লোক ঘুষখোর থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর খারাপ না, তারা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তারা অনেকে বললেন, বলুক না ওরা কী বলতে চায়। যা হোক সভার দিন সকাল সকাল আমরা উপস্থিত হলাম। যেয়ে দেখি আবার কংগ্রেসি মওলানাদের দলও এসেছে। তারা প্রস্তাব করলো যে, 'সভা করতে পারো আগে তবে বাহাস (বিতর্ক) করতে হবে। তোমরা পূর্বে বল, আর আমরা পরে বলবো।' বাধ্য হয়ে কিলের ভয়েতে আমাদের মেনে নিতে হলো। প্রায় দশহাজার লোক সভায় উপস্থিত হয়েছে। তারাও বললো, আচ্ছা দুই পক্ষের কথাই আমরা শুনব। হায় খোদা! দেখি প্রায় ৮/১০ জন বিরাট বিরাট মওলানা। এক জনের নাম এক পৃষ্ঠা, আলী হজরত থেকে আরম্ভ করে অনেকদূর বলতে হয়। আমার তো দেখে প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছে। তারা সভায় বহু কেতাব কোরান নিয়েও এসেছে; প্রমাণ করে দেবে যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া হারাম। ভাবি, হায় হায় শেষ হয়ে যাবো! আমার সাথে শুধু এক স্কুলের মৌলবি সাহেব, তিনি কিছু কোরান হাদিস জানেন। ওদের দিকে চেয়ে তারও অবস্থা কাহিল। আর আমার সাথে ছিল করিমগঞ্জ মহকুমার গণভোট কমিটির প্রেসিডেন্ট ফোরকান আলি মুন্সী সাহেব।

আমরা বিদেশি মানুষ, আমাদের পূর্বে বলতে দেওয়া হলো। স্কুলের মৌলবি সাহেব আধঘণ্টা খানেক কোরান হাদিস দিয়ে কিছু বোঝালেন। আর ফোরকান আলি মুন্সী সাহেব আধ ঘণ্টা কিছু বললেন। আর আমার ভাগ্যে হলো দুই ঘণ্টা। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে মাইক্রোফোন দিয়েছিলেন, আমি মাইক্রোফোনে বক্তৃতা শুরু করলাম। পীর সাহেবরা প্রথমে দাঁড়াইয়া ফতোয়া দিলেন, মাইক্রোফোনে কথা বলা হারাম। যা হোক, আমি ওদের হারাম আর

হালাল মানি কম। জানি, তা মানলে আর পাকিস্তান আসতো না। বক্তৃতা দুই ঘণ্টা দেওয়ার পরে কর্মীরা ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ’ শুরু করলো। জনসাধারণও তাদের সাথে মিলে বলতে আরম্ভ করলো। আর যায় কোথায়? পীর সাহেবরা দাঁড়াইয়া আমাকে ও কর্মীদের মারবার জন্য হুকুম দিলো। প্রায় ২/৩ শত লোক লাঠি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করলো। আমার সাথে কর্মীরা এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, “আমাকে মেরে যদি শান্তি পান, মারুন।” কিন্তু কিছুক্ষণ হৈচৈ করে আর মারল না, চলে গেল। এ ঘটনাটা বলা আমার এখানে উচিত কি না জানি না, তবুও বললাম এই উদ্দেশে যে, কেমন করে আমাদের দেশের একদল মওলানা টাকার লোভে কোরান হাদিসের মিথ্যা ব্যাখ্যা করতে পারে। কেন তারা এ কাজ করে? এর অর্থ, তারা এটাকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কোনো কাজকর্ম করে না, মানুষকে ফাঁকি দেয়, মাদ্রাসার নামে, মসজিদের নামে, লিল্লা বোর্ডিংয়ের নামে টাকা তুলে নিজেদের ভরণ পোষণ করে। চিয়াং কাইশেকের চীনে সেই দশা ছিল। কামাল আতাতুর্কের তুরস্কেরও সেই দশা ছিল।

শুধু মুসলমান সমাজের মধ্যেই এই কুসংস্কার ছিল না, চীন দেশে—বৌদ্ধ সমাজে এর চেয়ে বেশি ছিল। ইসলামের মূল কথা শান্তি, ঈমান, বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সেখানে ধর্ম যাজকদের দ্বারা শান্তির পরিবর্তে দেখা দিলো অশান্তি, ঈমানের পরিবর্তে বেঈমানি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের জায়গায় দেখা দিলো ভাই ভাইকে শোষণ বা নির্যাতন করা।

যেমন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মহামতি বুদ্ধ অহিংস নীতি প্রচার করেছিলেন—সেখানে দেখা দিলো হিংসা, ঘৃণা, অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ।

তেমনি আবার দেখা দিলো খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে, যেখানে ক্রাইস্ট বলে দিয়েছেন, ‘এক মুখে আঘাত করলে আরেক মুখ এগিয়ে দাও, ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ।’ কিন্তু খ্রিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসীরা দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করার জন্য যুদ্ধ করে। নয়া নয়া অস্ত্র তৈরি করে, তার দ্বারা জনসাধারণকে হত্যা করে, সেই দেশগুলিকে শাসন করার নামে শোষণ করে। দরকার হলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে বোমা মেরে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছেদ করে। এরাই আবার দুনিয়ায় প্রচার করে, ‘আমরা খ্রিষ্টান।’ এরা কি জেসাস ক্রাইস্টকে অপমান করে না? যেমন, আমরা মুসলমানরা অপমান করি দুনিয়ার শেষ নবী হজরত রসুলে করিমকে (সা.)। তাঁর আদর্শ পালন না করে তাঁর নাম ব্যবহার করি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। তেমনি ভারতের দিকে চেয়ে দেখুন, হিন্দু ধর্মের রক্ষকরা জায়গায় জায়গায় মুসলমানদের হত্যা করছে ধর্মের নামে। এক হিন্দু অন্য হিন্দুর ছোঁয়া পানি পর্যন্ত খায় না, কারণ জাত যাবে!

চীন দেশের অধিকাংশেরও বেশি লোক বৌদ্ধ। তারা সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের নামের দোহাই দিয়ে নিরীহ মুসলমানদের ওপর, খ্রিষ্টানদের উপর অত্যাচার

করেছে। চিয়াং কাইশেক সরকার এই অত্যাচার কোনোদিন বন্ধ করতে পারে নাই অথবা চেষ্টা করে নাই।

সরকার ইচ্ছা করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করতে পারে না, এ আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না। আজ হিন্দুস্তানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যদিও চান না কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করুক, কিন্তু তাঁর সরকারের পক্ষে দাঙ্গা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, তাঁর দলবলের মধ্যে এমন লোক আছে যারা এটাকে জিয়াইয়া রাখতে চায়। তাই পণ্ডিতজি শত চেষ্টা করেও দাঙ্গা থামাতে সমর্থ হচ্ছেন না। এই একইভাবে চিয়াং কাইশেকের চীনে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর ছারখার হয়ে যেত।

নয়াচীন সরকার দাঙ্গা নির্মূলে নজর দিলেন। বিপ্লবের পর মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউটিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পরে আজ পর্যন্ত একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও চীনে হয় নাই। যারাই চেষ্টা করেছে, সরকার কঠোরভাবে তাদের শায়েস্তা করে দিয়েছে।

আমাদের দেশে প্রোপাগান্ডা হয়েছে, নয়াচীনে ধর্ম-কর্ম করতে দেওয়া হয় না। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আর যদি আমি নয়াচীনে দেখতাম ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয় না, তবে সমস্ত দুনিয়ায় এর বিরুদ্ধে আমি প্রোপাগান্ডা করতাম। কারণ, আমি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মে বিশ্বাসী। এবং নিজে একজন মুসলমান বলে গর্ব অনুভব করি।

আমি নিজে চেষ্টা করেছিলাম–ভালোভাবে জানবার জন্য, মুসলমানদের অবস্থা কী? তারা এই সরকারের হুকুমতে কেমন আছে? কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে! পরে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, নয়াচীন সরকার কারও ধর্মকাজে বাধার সৃষ্টি করে না এবং যদি কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর বা তাদের ধর্মকাজে বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এ রকম অনেক ঘটনার কথা আমাকে অনেক মুসলমান বলেছেন। আমরা নিজেরা মসজিদে গিয়াছি, সেখানে মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। প্রত্যেক মসজিদে ইমাম আছে যারা ছেলেমেয়েদের কোরান হাদিস শিক্ষা দেয়।

ইমাম সাহেবরা বেতন পান। তাদের আমাদের দেশের মতো না খেয়ে ইমামতি করতে হয় না; আর পেট বাঁচানোর জন্য মিথ্যা ফতোয়া দেওয়া লাগে না। আর তাবিজ কবজ, ফুঁ ফাঁ দিয়া পয়সা নিতে হয় না এবং এই সমস্ত টাকা গ্রহণ করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যতদূর খবর নিয়া জানলাম, নয়াচীনে একটা প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম 'অল চায়না ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন।' এই প্রতিষ্ঠান থেকে পিকিং সরকারকে সাহায্য করা হয়। আর মুসলমানরা অর্থ দিয়া একে বাঁচাইয়া রাখে। এদের কাজ, ইসলামের নামে যে-সব কুসংস্কার চালু হয়েছে তা মুছে ফেলে

দেওয়া, যত মসজিদ আছে তার হিসাব নিয়া ইমাম নিযুক্ত করা। তাদের মাসে মাসে বেতন দেওয়া, আর অনেক ইমামকে জমি বা অন্য কাজ দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের পরের দানের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এরাই বড় বড় মাদ্রাসা করে, সেখান থেকে পাশ করলে 'মওলানা' বা 'মৌলবি' লেখা যায়। অন্য কোথাও থেকে পাশ করলে 'মওলানা' লেখার ক্ষমতা নাই। এবং এই কমিটিও তেমন কাউকে মওলানা হিসেবে গ্রহণ করবে না। পাশ করার পরে আবার একটা পরীক্ষা দিতে হয়। একটা বোর্ড আছে, বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করলে তাদের চাকরি দেওয়া হয়। ইচ্ছামত মাদ্রাসা করে ব্যবসা করা যায় না। এই কমিটি থেকে অনুমতি নিতে হবে। ঐ কমিটি অনুমতি দিলেই সরকারও অনুমতি দিবে। যদি কোথাও মসজিদ ভেঙে যায় বা মেরামত করতে হয় তবে কমিটি তা করবে জনগণের সাহায্য নিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্রাঞ্চ হিসেবে প্রাদেশিক, জেলা, মহকুমা কমিটিও আছে। পীর মুরিদির ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে যদি যক্ষ্মার ব্যারাম হয় তবে পীর সাহেব এক টাকা সোয়া পাঁচ আনা পয়সা নিয়া তাবিজ দিয়া বলে, 'ভালো হয়ে যাবা।' বেচারা বিশ্বাস করে পড়ে থাকে। একদিন ভুগতে ভুগতে মারা যায়, আর কিছু ব্যারাম বিলিয়ে রেখে যায়, হয় স্ত্রীর যক্ষ্মা হবে, না হয় ছেলেমেয়েদের হবে। এইভাবে রোগের বিস্তার ঘটে। তাই তাবিজ-কবজ ফুঁ ফাঁ বন্ধ হয়ে গেছে নয়াচীনে। তাতে ইসলামের কোনো ক্ষতি হয় নাই বরং উপকার হয়েছে। বসে বসে টাকা নেওয়া আর চারটা করে বিবাহ করা নয়াচীনে এখন আর চলে না, যা আমাদের দেশে সচরাচর চলে থাকে। আবার কেউ ৬০ বৎসর বয়সে ১৪ বৎসরের মেয়ে বিবাহ করে বসে থাকে। এমন অনেক গল্প চীন দেশে ছিল, আমাদের দেশেও আছে যে, পির সাহেবদের মুরিদরা মেয়ে দান করে। ৬০ বৎসরের পির সাহেব ১২ বৎসরের মেয়েকে বিবাহ করিয়া মুরিদের দান গ্রহণ করেন। নয়াচীনের 'ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' এই সমস্ত অন্যায় কাজ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

সাংহাই জামে মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের অনেক গল্প বলেছিলেন। মনে হলো এঁদের মতো ইমাম হলে দেশের যথেষ্ট উপকার হতো। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয় হায়! ৪ বৎসরে যে কুসংস্কার নয়াচীন ধ্বংস করেছে তা করতে আমাদের কত সময় লাগবে? মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বেঁচে থাকলে অন্ততপক্ষে এই কাজটা হতো। তিনি এ সমস্ত ধোঁকাবাজ, পরের টাকায় নির্ভরশীল মওলানা দেখতে পারতেন না। আজ আমাদের দেশেও ২/১ জন শিক্ষিত মওলানা আছেন, যাঁরা এই সমস্ত কুসংস্কার দূর করতে চান।

নয়াচীনে শুধু ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনই নাই, খ্রিষ্টান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনও আছে, বৌদ্ধ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনও আছে। তারাও তাদের সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। অস্ট্রেলিয়ার এক ভদ্রমহিলা–যিনি খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ছিলেন, প্রায় ৩০ বৎসর চীনে

আছেন–তাঁর কাছে খ্রিষ্টানদের কুসংস্কার সম্বন্ধে গল্প শুনেছি। তিনি শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। খ্রিষ্টানদের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কুসংস্কার বেশি ছিল। আজ আর কোনো কুসংস্কার চীন দেশে নাই। ধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানে আজ রাজনীতি চলে না, যা চলছে আজও আমাদের দেশে। অনেক নেতাকে আমি জানি, যারা মুসলিম লীগের সদস্য–যাদের সাথে আমি বহু দিন রাজনীতি করেছি–তারা ইসলামের যে কয়েকটা কাজ করা নিষেধ আছে, তার প্রত্যেকটা করে; আবার ইলেকশনে দাঁড়াইয়া বড় বড় পির মওলানাদের হাজির করে তাদের কাছ থেকে ফতোয়া নেয় টাকা দিয়া। বক্তৃতায় ইসলামের কথা বলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আমার যতদূর ইসলাম সম্বন্ধে জানা আছে তাতে আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু এই বেঈমানদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না।

এই রাজনৈতিক নেতারাই নিজেদের স্বার্থের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে–নিজেদের নেতৃত্ব রক্ষা করার জন্য। জনসাধারণকে ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে তাদের শাসন ও শোষণ করতে চায়। এরাই দুনিয়ায় ধর্মকে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে ধর্মের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে ও করছে। ধর্মের ভিতর যা আছে তা মানুষ সত্যিকারভাবে বুঝতে পারলে, আর তা পালন করলে দেশে শোষণ, অত্যাচার, অবিচার থাকতো কি না সন্দেহ! নয়াচীনে আজ আর কেহ রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে যার ইচ্ছা ধর্মকর্ম করতে পারে, কেহ তাকে বাধা দিতে পারবে না। আর কেহ ধর্ম পালন না করলেও কেহ জোর করে করাতে পারবে না। দুইটাই নয়াচীনে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রদায় হিসেবে সেখানে রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধরা শতকরা ৮০ জন বলে শতকরা ৮০টা চাকুরি তাদের দিবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা সেখানে নাই। যদি মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য হয়েও শিক্ষিত বেশি হয় চাকুরি তাহারাই বেশি পাবে। যে যে কাজে সক্ষম সে সেই কাজ পাবে, খ্রিষ্টান বলে অথবা মুসলমান বলে তাকে বাদ দেওয়া চলবে না। অনেক মুসলমান আছে যারা অনেক বড় বড় সরকারি চাকুরি অধিকার করে আছে। অনেক প্রদেশের গভর্নর মুসলমান। সৈন্যবাহিনীতে অনেক বড় বড় পদ মুসলমানরা অধিকার করে আছে। নয়াচীনের সৈন্যবাহিনীতে সংখ্যানুপাতে মুসলমান অনেক বেশি। যে অঞ্চলে মুসলমানরা বাস করে তারা *যোদ্ধা* নামে পরিচিত ও খুব সাহসী। নয়াচীন সকলকেই মানুষ হিসেবে বিচার করে; কে কোন ধর্মের তা দিয়ে বিচার হয় না। তাই নয়াচীন সরকার সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো সরকার এত ভালো কাজ করতে পারে নাই। যারাই নয়াচীনে গেছে তাহারাই এদের প্রশংসা করেছে, শুধু আমি একা হতভাগাই মুগ্ধ হই নাই।

আপনারা সকলে জানেন আতাউর রহমান সাহেব ও ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন সাহেব যাকে–মানিক ভাই বলে আমরা ডাকি, এঁরা দুজনেই কম্যুনিস্ট আদর্শের ঘোর বিরোধী হয়েও নয়াচীন সরকারকে প্রশংসা না করে থাকতে পারেন

নাই। আপনারা পীর মানকী শরীফকে সকলেই জানেন, তাঁর মতো গোঁড়া মুসলমান আমার চোখে জীবনে পড়ে নাই–যিনি নয়াচীনে যেয়েও মুসলমানদের পাক ছাড়া আর কারো পাক খান নাই, তাঁর মুখে এদের প্রশংসা শুনেছি।

আমাকে মুসলিম লীগওয়ালারা কম্যুনিস্ট বলতে ছাড়ে না; যদিও কম্যুনিস্ট আদর্শের সাথে আমার কোনো সম্বন্ধ নাই। আমি আলাদা পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি–তার ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী। শহীদ সাহেব কম্যুনিস্ট বিরোধী এবং মওলানা ভাসানী ইসলামের সত্যিকারের খাদেম। তাই ও কথা উঠে না, কিন্তু আমাদের দেশের একদল লোক আছে ভালোকথা বললেই কম্যুনিস্ট বলে চিৎকার শুরু করে। তাদের জন্যই আজ লোকের মধ্যে দিন দিন ধারণা হচ্ছে কম্যুনিস্টরাই বোধ হয় ভালো কথা কয়। নয়াচীনে কম্যুনিস্ট নীতি বলে কোনো নীতি দেখলাম না। দেশের ও জনগণের যাতে মঙ্গল হয় তাই তাদের কাম্য এবং সেই কাজই তারা করে।

গ্রেট ব্রিটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, লেবার পার্টি লিডার মি. এটলিও নয়াচীন সরকারকে প্রশংসা না করে পারেন নাই। আমাদের রাষ্ট্রদূতও নয়াচীন সরকারের প্রশংসা করেছেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, যে দক্ষতার সাথে এরা শাসন কার্য চালাইতেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়ার যেকোনো শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সাথে এদের তুলনা করা যাবে। একথা সত্য যে, তারা কম্যুনিস্ট নীতিতে বিশ্বাসী তবে, সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে তাদের যথেষ্ট তফাৎ আছে। রুশ বিপ্লবের পরে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি অনেক নতুন পথ অবলম্বন করে ভুল করেছে, পরে আবার তার সংশোধন করেছে। রাশিয়ায় যে ভুল হয়েছে সে ভুল নয়াচীন আজ আর করছে না।

দুনিয়ায় আজ অনেক আদর্শের সরকার আছে। কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও ফ্যাসিবাদ, কোথাও কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম। যে যে দেশে ফ্যাসিস্ট সরকার আর কম্যুনিস্ট সরকার কায়েম, সেখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক আদর্শকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। আবার অনেক দেশে গণতন্ত্র বলে চিৎকার করে, কিন্তু গণতন্ত্রের 'গ' অক্ষরও কায়েম হতে দেয় না সে দেশের সরকার। কারণ বিরোধী দল থাকলে তাদের অপকর্ম দুনিয়ার কাছে ধরা পড়ে এবং জনগণের চাপে গদি ছাড়তে বাধ্য হয়। তাই তারা ছলেবলে কৌশলে গদি রক্ষার জন্য নানা উপায় বাহির করে। এবং বিরোধী দলের নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে।

নয়াচীনে যার সাথেই আলাপ করেছি, দেখেছি তারা আমেরিকার কথা শুনলে যেন রাগে ফেটে পড়ে। অনেক কথার ও আলোচনার এবং অনেকগুলি কারণের মধ্যে, এর তিনটা কারণই প্রধান বলে মনে হলো। নয়াচীনকে ইউএন-এ ঢুকতে দিতেছে না; কোরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে আমেরিকা কোরিয়ানদের যুদ্ধে

হত্যা করেছে। চীনে জীবাণু বোমা ফেলেছে, চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করেছে। চিয়াং কাইশেক যে আজ ফরমোজাতে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরামে বাস করছে, তা একমাত্র আমেরিকার সাহায্যে।

নয়াচীনে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠেছে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ইউএনও কেন করা হয়েছে? সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি এক জায়গায় বসে যাতে তাদের ভিতরকার গোলমাল এবং নানা মতবিরোধ মিটমাট করতে পারে, তার জন্যই দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি আজ ইউএনও বা জাতিসংঘ গঠন করেছে। কিন্তু সত্যই এটা অন্যায় যে ৬০ কোটি লোকের একটা দেশ আজ ইউএনও-তে ঢুকতে পারছে না, কারণ তাতে আমেরিকার স্বার্থে আঘাত লাগে। দেখা যায়, থাইল্যান্ড, ইরাক, ইরান, ব্রহ্মদেশ, হল্যান্ড, বেলজিয়াম এমনকি ১০ লক্ষ লোকেরও দেশ ২/১টা আছে–যারা ইউএন-এর সদস্য, কিন্তু ৬০ কোটি লোকের দেশ ঢুকতে পারবে না! আর সে জায়গায় দেশ থেকে বিতাড়িত, দেশদ্রোহী বলে যাকে লোকে গালি দেয়, যে দেশ থেকে পালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমান একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে, পরের টাকায় কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে আছে–তার সরকার আজ ইউএনও তে সদস্য। এবং সেখানে দাঁড়াইয়া নয়াচীন সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে। চীনের লোক জানে যে এটা একমাত্র আমেরিকার ষড়যন্ত্র। তাই চীনের জনগণ মনে করে আমেরিকার সরকার তাদের শত্রু।

জীবাণু যুদ্ধে চীনের বহুলোকের ক্ষতি হয়েছিল। বহুলোক নানা রোগে ভুগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই সমস্ত দেখেই আমেরিকার বিরুদ্ধে নয়াচীনের জনমত। সত্যই এটা লজ্জার বিষয় যে আজ নয়াচীনের স্থান ইউএনও-তে নাই। কোনো মতবাদই নয়াচীনের ইউএনও-তে যোগদানে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। যাদের মধ্যে সামান্য মনুষ্যত্ব আছে তাদের চোখেও আজ এই ঘটনা চোখে না পড়ে পারবে না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়াচীনের মনোভাব খুব খারাপ দেখলাম না। কারণ নয়াচীন সরকারকে ইংরেজরা স্বীকৃতি দিয়েছে। পিকিংয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আছে। নয়াচীনের লোক মনে করে ইংরেজরা যাই হোক তাদের কিছুটা মনুষ্যত্ব আছে। এবং বোঝবার মতো ক্ষমতাও রাখে। হংকং চীনের মূলখণ্ডের ভিতর একটা ইংরেজ কলোনি। ইচ্ছা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নয়াচীন উহা দখল করে নিতে পারে। কিন্তু তারা মনে করে হংকং ইংরেজের দখলে থাকলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হবে। কথাটা যে কিছুটা সত্য তাতে সন্দেহ নাই।

অনেক ইংরেজের ব্যবসা আছে সাংহাইতে। আমেরিকার সমস্ত কলকারখানা আজ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে নয়াচীন সরকার। কিন্তু ইংরেজদের কলকারখানা আজও বাজেয়াপ্ত করে নাই। কারণ নয়াচীন আজ চায় যত দেশের সাথে বন্ধুত্ব করা যায় ততই তাদের জন্য মঙ্গল।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সম্বন্ধে তাদের ধারণাও খুব ভালো, কারণ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের

রাষ্ট্রদূত নয়াচীনের পিকিং শহরে আছে। যাদের সাথে আমার আলাপ হয়েছে, মনে হয়, তারাই পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব করতে ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে খুবই আগ্রহশীল।

পাকিস্তান নয়াচীনকে ইউএনও-তে গ্রহণ করবার জন্য ভোট দিয়াছিল একথাও অনেকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছিল। এশিয়াবাসী এক হয়ে পশ্চিমা শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক এটাও তাদের একটা দাবি। তারা মনে করে, যুগ যুগ ধরে পশ্চিমের শক্তিবৃন্দ এশিয়ার বহু দেশকে শোষণ করেছে। আজ সময় এসেছে এশিয়ানদের শোষণ বন্ধ করার। তারা মনে করে এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে যেন বন্ধুভাব গড়ে উঠে।

নয়াচীনের উন্নতি দেখে সত্যিই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি দশ বৎসর তারা দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে গড়তে পারে তবে দেশের জনসাধারণের কোনো দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না, অশিক্ষা কুসংস্কার মুছে যাবে। এবং দুনিয়ার যে কোনো শক্তির সাথে তারা মোকাবেলা করতে পারবে সকল দিক থেকে, কারণ জাতিকে গড়ে তোলার যে প্রধান শক্তি জনসাধারণের মনোবল তা নয়াচীনের জনগণের মধ্যে আছে। নয়াচীনের অনেক কিছুই আমার ভালো লেগেছিল একথা সত্য। কিন্তু নয়াচীন সরকার কম্যুনিস্ট মতবাদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদের লোককে রাজনীতি করতে দেয় না। একমাত্র নয়াচীন–নেতা মাও সে তুংয়ের 'নয়া গণতন্ত্রে'র নীতি যারা বিশ্বাস করেন তাদেরই রাজনীতি করার অধিকার আছে। অন্য কোনো নতুন আদর্শের দল সৃষ্টি করার অধিকার কারও নাই। যদিও নয়াচীন সরকারের বড় পদগুলিতে কম্যুনিস্ট ছাড়া দু'চার জন নন কম্যুনিস্ট আছেন, তবে ধরে নিতে হবে তারা কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্ন এবং কম্যুনিস্টরা যা বলে তাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। ধরুন, একজন সাধারণ নাগরিক মনে করে সরকার যেভাবে দেশকে গড়তে চেষ্টা করছে তাহাতেই দেশের মঙ্গল।

আমার মতে, ভাত কাপড় পাবার ও আদায় করে নেবার অধিকার মানুষের থাকবে, সাথে সাথে নিজের মতবাদ প্রচার করার অধিকারও মানুষের থাকা চাই। তা না হলে মানুষের জীবন বোধ হয় পাথরের মত শুষ্ক হয়ে যায়।

# আমার দেখা নয়াচীনের খাতার নোটস্

রেঙ্গুন, থাইল্যান্ড, ব্যাঙ্কক, এরোড্রাম, শ্যামদেশ, হুয়েন সাং, ফা হিয়েন, সিংহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। হংকং, নাম ভিক্টোরিয়া কৌলুন হোটেল। কইতেক বিমানঘাঁটিতে নামলাম

কাউহু স্টেশন–চীনের শেষ স্টেশন–মেনচুন কমুনিস্ট চীনের স্টেশন। ট্রেনে দুইটা ক্লাস শক্ত ও নরম।

ক্যান্টন শহরের মাঝে মাঝে পূর্ববাংলার মতো–পার্ল নদীর পাড়ে সাইচুং হোটেল।

ক্যান্টন থেকে পিকিং দেড় হাজার মাইল।

সত্যি যে চীনের সাথে কারো তুলনা হয় না।

ক্ষিতীশ বোস পিরোজপুরের লোক। ক্যান্টন শান্তি কমিটির সভা। ক্যান্টন শুয়োরের মাংস মাসলেকের মধ্যে।

১৯১২ সালে মাঞ্চু সম্রাটদের শেষ করে সান ইয়াৎ-সেন ক্ষমতা দখল করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর। ক্যান্টন থেকে হুয়াং কাইও, চীনের সর্ববৃহৎ নদী ইয়াংসি নদীর পাড়।

কুয়েমিনসিং–সব ধ্বংস করে গেছে পালাবার সময়। পিকিং চীনের পুরানা শহর। ইংরেজ, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স অনেকেই পিকিং আক্রমণ করেছে।

সাততলা অট্টালিকা পিকিং হোটেল। Forbidden City–আলাদা একটি শহর পিকিং শহরের ভিতরে। রাজারা থাকতেন তাঁর সামন্তদের নিয়ে। সৌন্দর্যে ভরা এই নিষিদ্ধ এলাকা। এর মধ্যে না আছে এমন কিছুই নাই। পার্ক, লেক–এখন শহরটা সকলের জন্য। এখানে লাইব্রেরি, মিউজিয়াম শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। হাজার হাজার লোক আসে এই শহরে আরাম করতে, হাওয়া খেতে। 'Gate of heavenly Peace.' চীনারা বলে তিয়েন আন মেন। এখানে দাঁড়িয়ে মাও সে তুং অভিবাদন গ্রহণ করেন।

১লা অক্টোবর ১৯৪৯ সালের এই দিনে মুক্তিবাহিনী চীনকে মুক্ত করেছিল। মাও, লিও, চ্যু তে, চু এন লাই এবং নেইবো। চীনা টাকার নাম ইয়ুয়ান, কেউ বলে ইয়েন। হংকংয়ে ২০ টাকা বদল করলাম যা পেলাম তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে এক বস্তা কাগজ পেয়েছিলাম কয়েক কোটি ইয়েন হবে। ইনফ্লেশন যাকে বলে।

Summer Palace গ্রীষ্ম প্রাসাদ

নানা রকমের জীব-জানোয়ারের মূর্তি। সকলের উঁচু জায়গায় বৌদ্ধমন্দির। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমোদনগরী এই জায়গা, ভিতরে বিরাট লেক। এখানে সকল কিছুই আছে পার্ক, বড় ছোট রাস্তা। লেকের মধ্য জায়গায় একটা দ্বীপ।

শান্তির কপোত

মণিমাণিক্য দিয়ে সাজানো বুদ্ধমূর্তি থেকে লুটপাট করে নিয়েছে বিদেশি শক্তি। ভারত-পাকিস্তানের মতো মেজর-জেনারেল, রেজা-মাহবুব-তৃতীয় লেবেলের একমাত্র বাঙালি কর্মচারী।

তুর্কি কবি নাজিম হিকমত–রাশিয়ার লেখক আনিসোমভ

মহাপ্রাচীর

ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া।

সপ্ত আশ্চর্যের একটি দেওয়াল। দেড় হাজার মাইল লম্বা প্রাচীর। বোধ হয় দুই হাজার বছরের বেশিদিন হবে নির্মাণ হয়েছে।

শান্তি হোটেল ও পিকিং হোটেল। সকল জিনিসের একদাম।

গলাবন্ধ কোট আর মোটা কাপড়ের প্যান্ট সকলেরই ড্রেস। ১০ই সেপ্টেম্বর ভারতীয়রা আমাদের খাবার দাওয়াত করলেন। না করার পরে ওদের খাওয়াইছিলাম।

১লা অক্টোবর বাঁ দিকের গ্যালারিতে আমাদের জায়গা–পতাকা ও জনগণের সমুদ্র। তৃতীয় উৎসব। ১০টায় আসবেন মাও সে তুং–সুন চিন লি; চ্যু তে পাশে আছেন।

সৈন্যরা অনেক মহড়া দেখালো জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর। কৃষক মজদুর পায়োনিয়ার ফোর্স।

দাওয়াত খাবার দিন মাও সে তুংকে ভালোভাবে দেখতে হবে। ইউসুফ হাসান।

তাহেরা মাজহার। শান্তি সম্মেলনে সাঁইত্রিশটা দেশ যোগদান করেছে ।

কপোত থাকা, শান্তির কপোত সকল দিকে। সাঁইত্রিশটা দেশের পতাকা। পাকিস্তানের সকলেই আমরা পাশাপাশি বসেছি। টেবিলে হেডফোন আছে। সিটে নাম লেখা রয়েছে। চারটা মূল ভাষায় বক্তৃতা শোনা যায়। মূল ভাষার বক্তৃতা করলে অন্য ভাষায় শোনা যায়। ইংরেজি, চীনা, রুশীয়, স্পেনিশ। হাই পার্ক দেখতে গেলাম এক রাতে।

ডা. ফরিদীর ডাক নাম কিসলু, মনোজ বসু গেলেন।

White Haired girl চীনা ছবি। প্রসিদ্ধ নাটক (সাদা চুলের মেয়ে)

ক্ষিতীশ বাবু বাংলা গানে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

ধর্ম–কন ফুসিয়ান বেশি, তারপর বৌদ্ধ, তারপর মুসলমান। মসজিদ আছে কয়েকটা, মুসলমানদের মাথায় গোলটুপি। খ্রিষ্টান আছে কিছু।

প্যাগোডা

Temple of Heaven (স্বর্গমন্দির) ফসল ফলানোর মন্দির; দেশে যাতে ভালো শস্য হয় তার জন্য পূজা করা হতো। সূর্য, চন্দ্র, হাওয়া ও বুকীর পূজা বলা যায়।

৮৬ (ছিয়াশি) জন বক্তৃতা করে ১১ দিন সম্মেলন চললো।

১২ই থেকে আমরা। কনকনে শীত।

জমিদারি বাজেয়াপ্ত। চাষির মধ্যে জমি বিলি ব্যবস্থা। নানকিন, টিয়েন সিং, সাংহাই, হ্যাংচাউ (পশ্চিম হ্রদ) ক্যান্টন ১৯১১ সালে সান ইয়াৎ-সেনের দল আক্রমণ করে।

১৯৪১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হক সাহেব জাতীয় মন্ত্রিত্ব গঠন করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সাথে নিয়ে। মুসলিম লীগ–নাটোর।

১৯৪৩–২৮শে মার্চ হক সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৪৩ সালে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই খাজা সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৪৬ সালের ২২শে এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী শপথ গ্রহণ করেন।

# আলোকচিত্রে
# শেখ মুজিবুর রহমানের
# আমার দেখা নয়াচীন
# ১৯৫২

শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পোস্টার

সম্মেলনকক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রতিনিধিদলের দলনেতা পীর সাহেব মানকী শরীফ, মাঝে মঞ্চে উপবিষ্ট বঙ্গবন্ধু

ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন (Soong Ching Ling)

শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তুরস্কের কবি নাজিম হিকমত ও অন্যরা

মাও সে তুং

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের দলনেতা সাইফুদ্দিন কিচলু

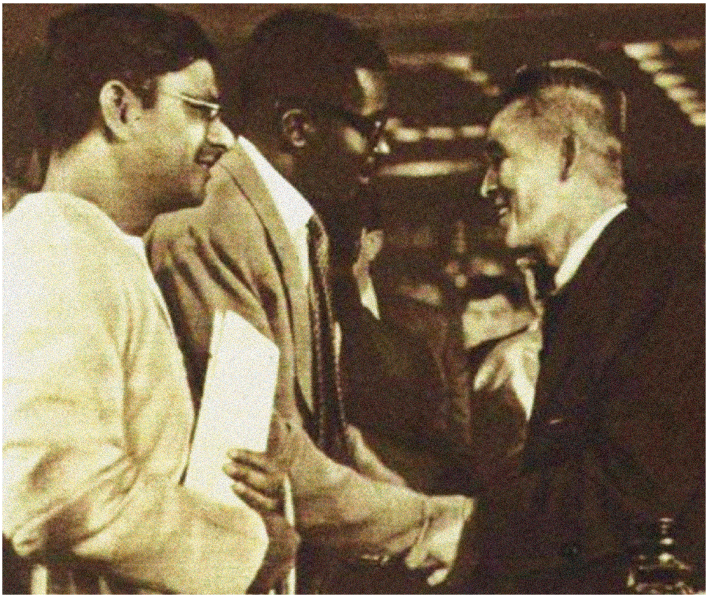

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেড অব ডেলিগেশন ও নর্থ কোরিয়ার প্রতিনিধি Han Xueye

শান্তি সম্মেলনে আলিঙ্গনাবদ্ধ ব্রিটিশ প্রতিনিধি Monica Felton এবং মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি Zeng Xuchong

পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স, অক্টোবর ১৯৫২

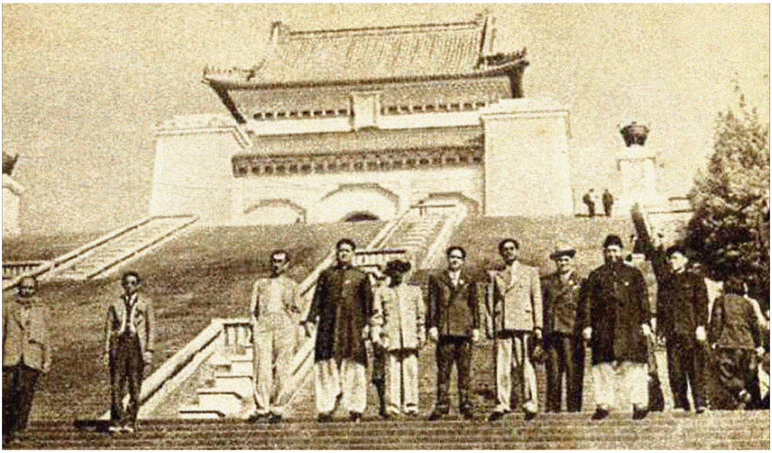

সান ইয়াৎ-সেন-এর সমাধির সামনে প্রতিনিধিদলের অন্যান্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মঞ্চে সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স, অক্টোবর ১৯৫২

পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স, অক্টোবর ১৯৫২

সম্মেলনকক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শিল্পী পিকাসো'র আঁকা সম্মেলনের প্রতীক শান্তির কপোত কপি করছেন শিল্পীরা

শান্তি সম্মেলনে আগত উৎফুল্ল শিশু-কিশোরদের সমাবেশ

শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সদস্য বক্তৃতারত তাহিরা মাজহার আলী

১লা অক্টোবর নয়াচীনের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যারেড

নয়াচীনের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যারেডে মাও সে তুং, ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন, চ্যু তে

১লা অক্টোবর নয়াচীনের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যারেড

১লা অক্টোবর নয়াচীনের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যারেড

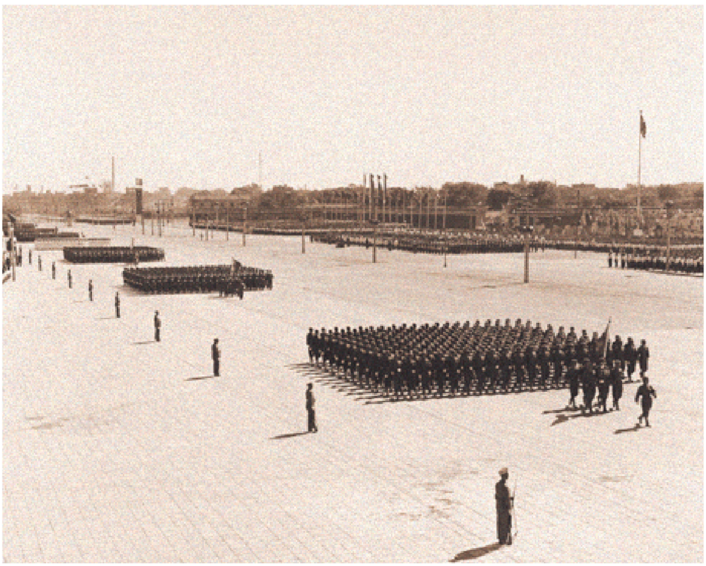

১লা অক্টোবর নয়াচীনের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যারেড

১লা অক্টোবর নয়াচীনের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যারেড

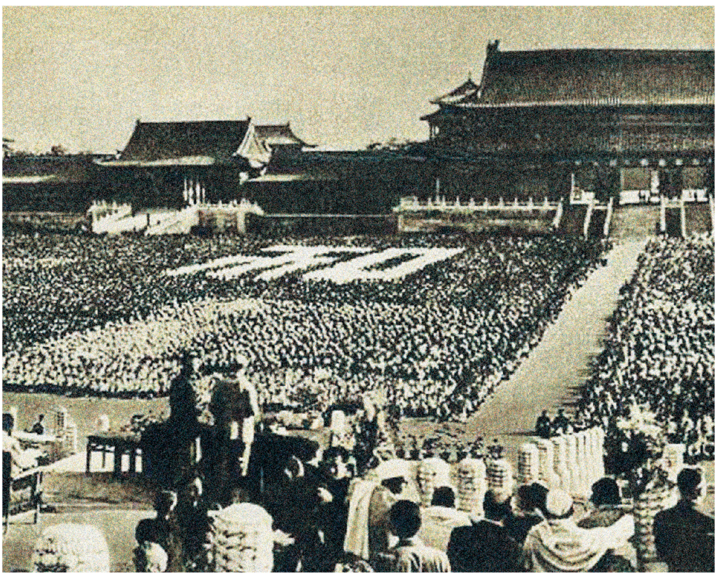

শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশ

Saifuddin Kitchlew, senior Indian delegate and Pir Manki Sharif, senior Pakistan delegate, embrace each other

Kitchlew, Sharif, Wheaton and Guo (obscured).

শান্তি সম্মেলনে কাশ্মীর ইস্যুতে চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাকিস্তান ও ভারতের দলপ্রধানদ্বয় আলিঙ্গন করছেন

শান্তি সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্ট্যাম্প ও ফার্স্টডে কাভার

★慶賀亞洲及太平洋區域和平會議的賀電。
★眞理報社論：和平保衛者的力量在增長。

首都昨日隆重舉行慶祝典禮

毛主席朱總司令出席閱兵檢閱群衆遊行隊伍

中央人民政府毛澤東主席國慶節在天安門閱兵並檢閱羣衆遊行隊伍。圖為毛主席向遊行隊伍舉手答禮。旁為向毛主席獻花的兒童。 侯波攝

【本報訊】據新華社訊：中華人民共和國成立第三周年國慶節慶祝典禮，昨日在首都天安門廣場隆重舉行。

回國觀光團的全體人員以及遭受帝國主義迫害的馬來亞歸國難僑的代表。

學校、航空學校、傘兵部隊、公安部隊的隊伍。在他們後面跟進的是民兵大

右：中國人民解放軍朱德總司令宣讀中國人民解放軍總部給全國武裝部隊的命令。 新華社稿 袁苓攝

左：天安門檢閱台上的中央人民政府首長及貴賓。 侯波攝

全場群衆的歡呼和鼓掌。

中國人民解放

দি পিপল্‌স্ ডেইলি, ২রা অক্টোবর ১৯৫২

দি পিপল্‌স্‌ ডেইলি, ২রা অক্টোবর ১৯৫২

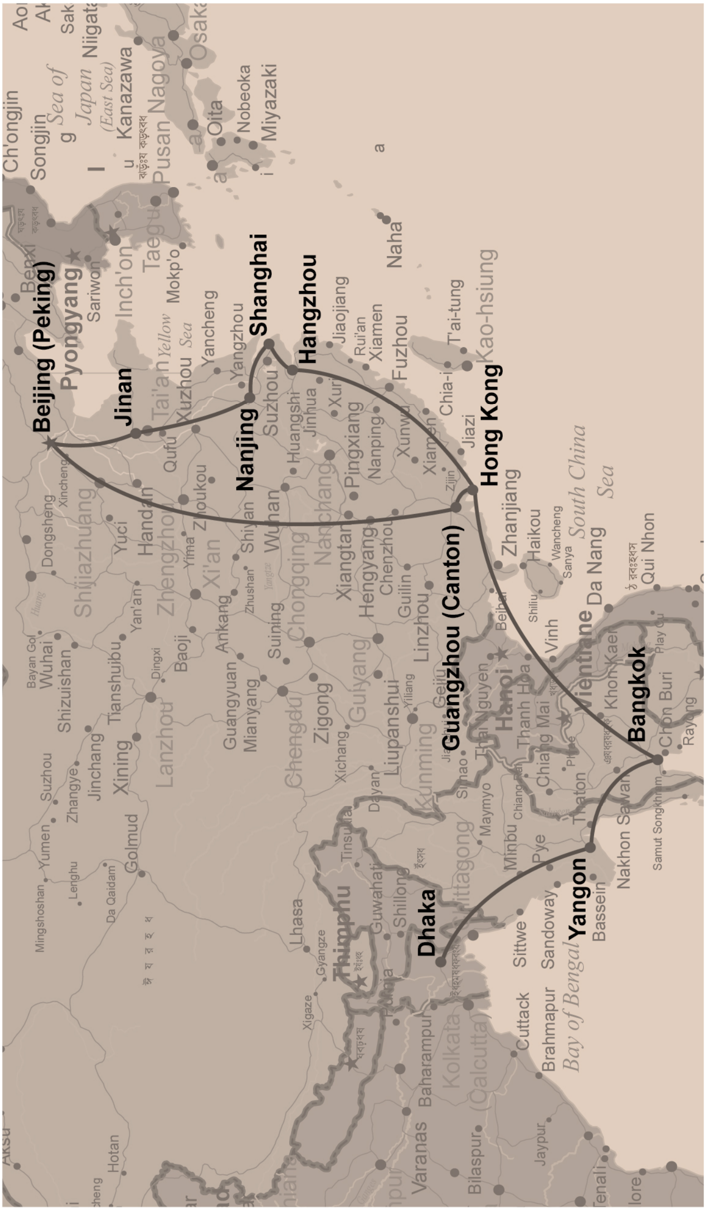


মানচিত্রে বঙ্গবন্ধুর নয়াচীন ভ্রমণের পথচিত্র

শেখ মুজিবুর রহমান
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
চৌ এন লাই
ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন
ঢাকা, ১৯৫৬

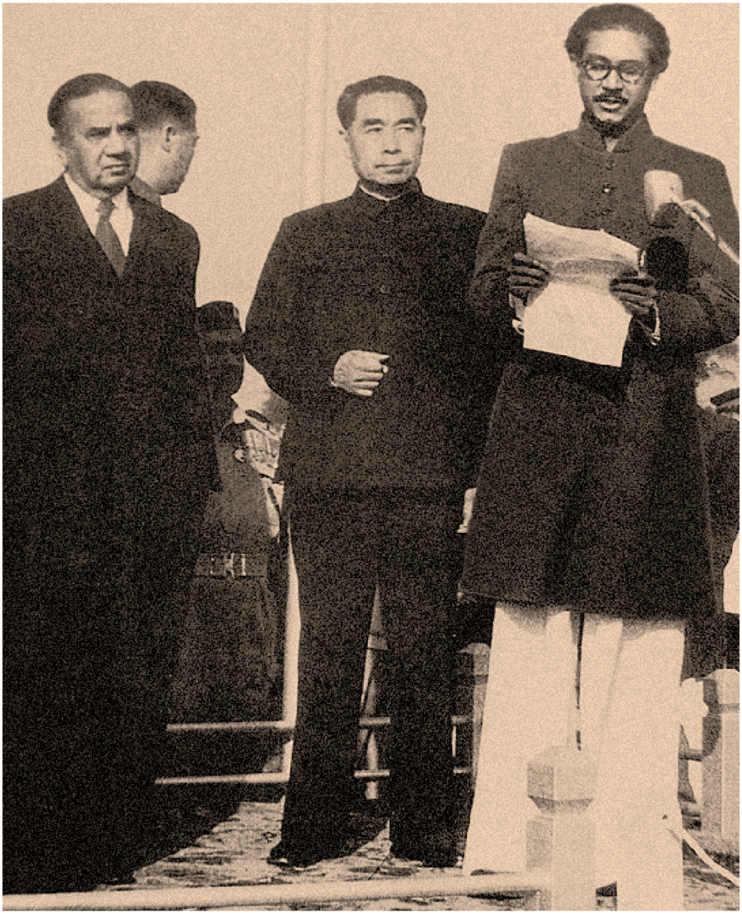

১৯৫৬ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় আসেন, তাঁর সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন শেখ মুজিবুর রহমান

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং চৌ এন লাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান অনুষ্ঠান, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

# আলোকচিত্রে
# শেখ মুজিবুর রহমানের
# চীন সফর
# ১৯৫৭

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাও সে তুং

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাও সে তুং

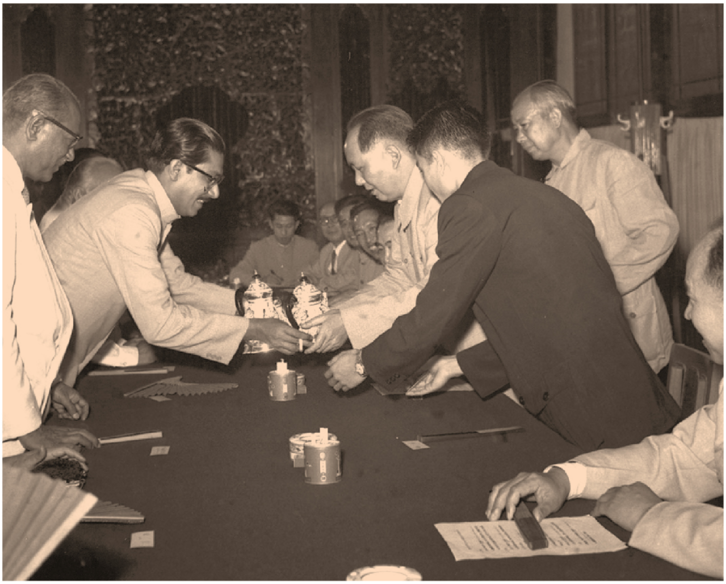

মাও সে তুং-এর হাত থেকে উপহারসামগ্রী নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন চীনা তরুণী

সম্মেলনকক্ষে বক্তৃতারত শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শহর দেখছেন বঙ্গবন্ধু

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান, মাও সে তুং এবং প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ

শেখ মুজিবুর রহমান, ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন ও প্রতিনিধিদলের অন্যরা

চীন সফরের সময় একটি ঘরোয়া বৈঠকে বঙ্গবন্ধু

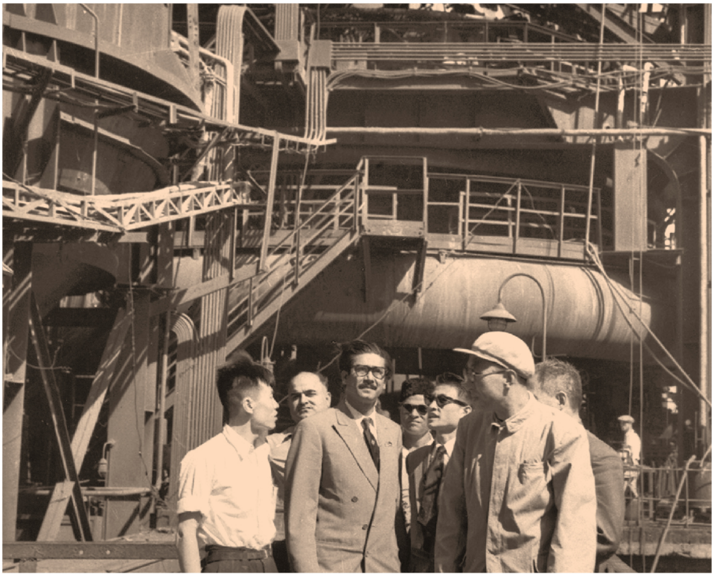

চীন সফরের সময় একটি কারখানা পরিদর্শন করছেন বঙ্গবন্ধু

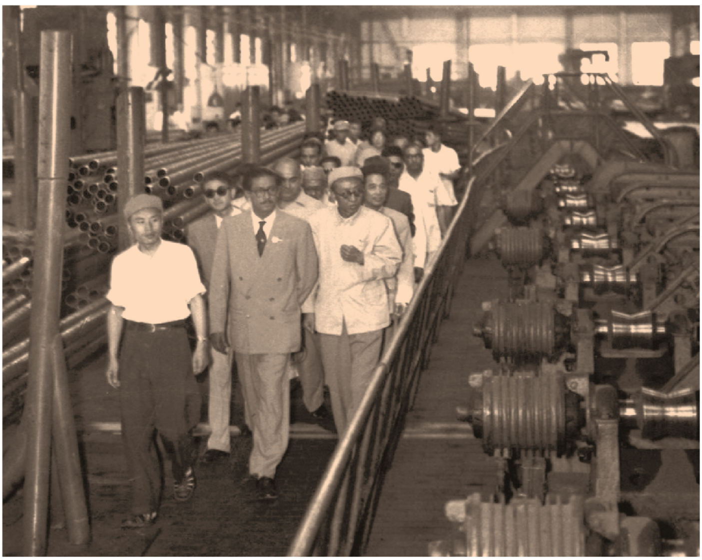

নয়াচীনের একটি কারখানা পরিদর্শন করছেন শেখ মুজিবুর রহমান

চীন সফরের সময় একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

পায়ে হেঁটে শহর পরিদর্শনরত শেখ মুজিবুর রহমান

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু

নয়াচীন সফরের সময় একটি নৈশভোজে অন্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু